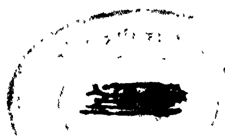






উপসর্গ।

(বর্ত্তমান যুগের।)

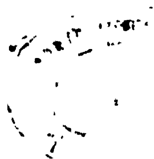


"Truth is stranger than Fiction."

কলিকাতা, ৩৬ নং বনমালি সরকারের ষ্ট্রীট,
" কমলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ " হইতে
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ হালদার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১৫ সাল।

মূল্য কাপড়ে বাঁধাই ৸৶ আনা। কাগজে বাঁধাই ॥৶ আনা।



বিজ্ঞাপন।

—*○*—

এই পুস্তকের কয়টী প্রবন্ধ ইতিপূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধগুলি পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া অপর কতকগুলি নূতন প্রবন্ধ সংযোজিত করতঃ পুস্তকাকারে সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

উপসর্গ ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয় নাই; তবে যদি কেহ নিজের প্রতিকৃতি বলিয়া মনে করেন গ্রন্থকর্ত্তা নাচার। বর্ত্তমান সময়ে সমাজের দেহে অসংখ্য উপসর্গ বিদ্যমান, তাহারই কয়টির চিত্র এই ক্ষুদ্র পুস্তকে চিত্রিত হইল। চিত্রকরের যত্ন সফল হইয়াছে কি না তদ্বিচার ভার পাঠকবর্গের হস্তে।

ইতি,—
৫ই অগ্রহায়ণ,
সন ১৩১৪ সাল।

গ্রন্থকার।



উৎসর্গ পত্র

পরম পূজ্যপাদ

৺পিতৃদেবের চরণ

উদ্দেশ্যে

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ কুসুম

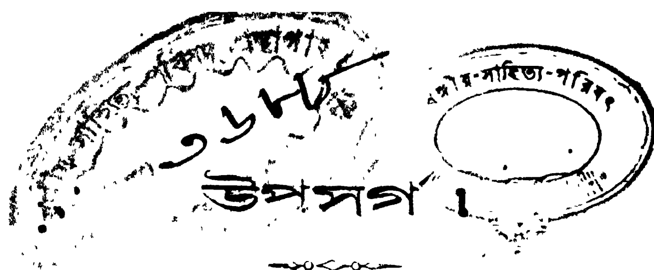
ভক্তি-গঙ্গাজলে সিক্ত

ও

শ্রদ্ধাচন্দনে চর্চ্চিত করিয়া

উৎসর্গ

করিলাম।



উপসর্গ।

প্রথম কাণ্ড।

পণ্ডিত আদর মহাশয়টি কোনো সুখ নাহি।
[illegible] আহার নাহি। কবির।

জনশ্রুতি এইরূপ পূর্ব্বকালে কোন বৈয়াকরণিক, ব্যাকরণ বিশেষের টীকা লিখিবার অভিপ্রায়ে নির্জ্জন বনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিছুক্ষণ পরে তথায় একটী ব্যাঘ্র উপস্থিত হয়। বৈয়াকরণিক ভায়া তখন "ব্যাঘ্র" শব্দের ধাতু প্রত্যয় আওড়াইয়া বলিতে লাগিলেন অয়ং ব্যাঘ্রঃ। ব্যাঘ্র শব্দ "ঘ্রা" ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। "ঘ্রা" ধাতুর অর্থ ঘ্রাণ লওয়া, সুতরাং ব্যাঘ্র আমার কি করিবে? কেবল মাত্র আমার দেহের ঘ্রাণ লইয়া যাইবে; তবে আর আমার ভয় কি? এই বলিয়া বৈয়াকরণিক পণ্ডিত ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা হেতু সাহসী বীরেরন্যায় অটুট রহিলেন। ব্যাঘ্রাচার্য্য পণ্ডিতকে বিশেষরূপে ব্যাকরণ বুঝাইতে আরম্ভ করিল। পণ্ডিত মহাশয়ের তখন চৈতন্য হইল।

তিনি বলিয়া উঠিলেন—"অহো মূর্খোহং" উপসর্গ যোগেন ধাত্বর্থ বলাদন্যত্র নীয়তে" ইহা আমার স্মরণ ছিল না। উপসর্গ যোগে "ঘ্রা" ধাতুর খাদন অর্থ হইল। আমার সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। পণ্ডিত মহাশয়ের জ্ঞানচক্ষু তখন উন্মীলিত হইল। প্রস্তাব সত্যই হউক কিংবা মিথ্যাই হউক বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। গল্পটী অলীক হইলেও সাহিত্যক্ষেত্রে প্র, পরা প্রভৃতি বিংশতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর বা শব্দ (যাহাই বল না কেন) বিশেষ বলীয়ান্ তাহার আর সন্দেহ নাই। উহাদিগকে দেখিতে অতি ক্ষুদ্রাবয়ব হইলেও কার্য্যে তাহাদের অসীম বল। তাহা অধিক দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান নিষ্প্রয়োজন। "প্রকৃষ্ট" ও "নিকৃষ্ট" মধ্যে তারতম্য বুঝিলেই বলের পরিচয় পাইবে।

সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দেও, উপসর্গের অদ্ভুত ক্ষমতা কোথায় না দৃষ্ট হয়?—সংসার পানে একবার দৃষ্টিপাত কর, ঐ যে তোমার একমাত্র পুত্র আজ কয়েকদিন যাবৎ জ্বরে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, উত্থান শক্তি রহিত; রীতিমত চিকিৎসিত হইতেছে দেখিয়া, তুমি আশ্বস্ত রহিয়াছ; কোন উপসর্গ নাই বলিয়া তাহার আরোগ্যের আশা তোমাতে বলবতী রহিয়াছে। তুমি নির্ভীক ও নিঃশঙ্কচিত্তে আফিসের কার্য্যকলাপ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেছ; কিন্তু আজি প্রবীণ চিকিৎসক রোগীর পার্শ্বে বসিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে যন্ত্রাদি দ্বারা বিশেষরূপে

পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "রোগীর অনেক উপসর্গ দেখা যাইতেছে"; অমনি তোমার মুখ-মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় হইয়া উঠিল। সাহস ভরসা অন্তর্হিত হইল; ভাবনার কূপ ক্রমেই প্রশস্ত হইতে লাগিল। পরিবার মধ্যে চিকিৎসকের কথা কাণাকাণি হইয়া ছড়াইয়া পড়িল। সকলেই আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া রোগীর নিকট আসিতে লাগিল। গৃহের মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। গৃহে বিষাদের ছায়া পড়িল। বল ভাই কেন আজি সহসা পট পরিবর্ত্তিত হইল? এখন বুঝিতে পারিলে উপসর্গের কি অপরিমিত ক্ষমতা, কি অসীম তেজ। যে গৃহ, চিকিৎসকের কথা ওষ্ঠ হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে সন্তোষের প্রাসাদ বলিয়া বিবেচিত হইতেছিল; সেই গৃহ মুহূর্ত্ত যাইতে না যাইতেই ভাবনার আগার, বিষাদের লীলা-ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল। তাই বলি উপসর্গ বড় ভয়ানক কথা। উপসর্গের কথা শুনিলেই রোগীর আত্মীয় স্বজন সকলেই জড়বৎ হইয়া যায়। তবু কি বলিবে উপসর্গ কিছু নয়?

নিদানে ভিন্ন ভিন্ন রোগের ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সংসারেও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গ ভিন্ন ভিন্ন সময় প্রভুত্ব করিয়াছে ও করিতেছে।

দ্বিতীয় কাণ্ড।

[illegible]

[illegible] কবির।

সংসারের দুই একটি উপসর্গের কথা বলা যাক্। সংসারে স্ত্রীই পুরুষের প্রধান উপসর্গ। কি সর্ব্বনাশ! কি ভয়ানক কথা বলিলাম। সভ্য জগৎ, আমাকে একেবারে দণ্ডবিধির চরম শাস্তি প্রদানে উদ্যত হইবে। শত সহস্র পাঠকও এই কথা পড়িয়া একেবারে চতুর্দ্দিক হইতে তীক্ষ্ণবাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিবে। তবু আমি কেমন পাগল; এই সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও ভাবী বিপদ চক্ষের উপর দেখিয়াও এই কথা লিখিলাম। লেখনি! তুমি সাবধান হও। জগতের সভ্য শ্রেণী তোমাকে পথে ঘাটে বিদ্রূপ করিবে। তীব্র সমালোচনার লৌহ কটাহে তোমাকে একেবারে ঝলসাইয়া ফেলিবে। তুমি এ কথা কখনও কাগজে বাহির করিও না। নিজের বৈঠক খানায় বসিয়া চুপে চুপে যাহা লিখিলে, তাহা আর প্রেসে পাঠাইও না। সেই কবির কথা কি তোমার স্মরণ নাই?

Woman, devine woman!
heaven made thee
To temper man; we had been
brutes without you

স্ত্রীই মানব-উদ্যানের একমাত্র প্রস্ফুটিত কুসুম, এক মাত্র সৌরভের ভাণ্ডার। তবু তুমি তাহাকে উপসর্গ বলিয়া ঘোষণা করিতেছ। হউক উপসর্গ তাহাতে ক্ষতি নাই; তবু আমরা ঐ উপসর্গের পদতলে পড়িয়া তাহার অলক্ত-রঞ্জিত-চরণ-পদ্মের সুধারাশি পরিমল-লোলুপ-মধুমক্ষিকার ন্যায় সতত পান করিব। ঐরূপ উপসর্গই আমরা চিরদিন বাঞ্ছা করি। বলুক না কেন জনৈক অসভ্য কবি :—

"দিন্‌কো মোহিনী রাৎকো বাঘিনী
পলক পলক লহু চোষে,
দুনিয়ার লোক সব বাউরা হোকে
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।"

কিন্তু যে কথা বলিতেছিলাম, সে কথার সূত্র ছাড়িয়া বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। সয়তান ঈশ্বরের বিরোধী, ভগবানের লীলাক্ষেত্র এই জগতে নিজের প্রভুত্ব দেখাইবার জন্য সয়তান "ইবকে" বলিলেন সুন্দরি! এই যে তোমার পার্শ্বে সুন্দর ফল-রাজি সুশোভিত বৃক্ষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে; ঐ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ কর। দেখিবে উহার ফল কেমন সুস্বাদু। আদ্যা রমনী সয়তানের কথায় প্রথমতঃ কর্ণপাত করিলেন না বরং বলিলেন ভগবানের নিষেধ, ঐ ফল আমরা কখন সেবন করিব না। সয়তান তখন মনোহর বাক্য বিন্যাসে বামাকে বুঝাইলেন, ঈশ্বর তোমাদের প্রতি কুপিত; তাহাতে তোমাদিগকে ঐ ফল সেবনে নিষেধ

করিয়াছেন। সয়তানের বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও অমানুষিক প্রতিভার নিকট কি "ইব" দাঁড়াইতে পারেন? কাজেই যুক্তি ও তর্কে পরাস্ত হইয়া ঐ বৃক্ষের ফল লইলেন এবং স্বামী সহ একত্রে ভক্ষণ করিয়া সংসারকে পাপস্রোতে ভাসাইলেন। সয়তানের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। যে পাপ তরুর বীজ সয়তানের প্ররোচনায় আদ্যা জননা সংসার উদ্যানে রোপন করিলেন, সেই পাপের ফল (যদি বাইবেল বিশ্বাস কর) হস্তে করিয়া আমরা সকলেই ভূমিষ্ঠ হইতেছি। সাধ্য কার সে পাপের হাত হইতে এড়ায়? কার এমন তপস্যার বল যে, সে ঐ পাপের সীমানার বাহিরে যায়।

বাইবেল বলিবে হউক শুকদেব! ব্যাস বাক্যে জন্ম-গ্রহণ হেতু যে পাপ তাহার প্রত্যেক, লোমকূপের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত ছিল, শোণিতের সঙ্গে যোগ হইয়াছিল, তাহা হইতে তাহার নিষ্কৃতি কোথায়? সৃষ্টির প্রথমা রমণীর ঐ পাপতরুর (বাইবেল মতে জ্ঞানতরুর) ফল ভক্ষণ হেতু "আদম" ও তৎসন্তান-সন্ততির দুঃখ নিরবচ্ছিন্ন ও অচ্ছেদ্য হইল। সুখের সংসার দুঃখের হইল। আনন্দের বাজার নিরানন্দের হইল। হরি, হরি!! আদি-সৃষ্টি মানবী হইতে মানবের দুঃখ সংসারক্ষেত্রে আসিয়া পড়িল। সেই হইতেই বোধ হয় ইংরাজি ভাষার, woman (woe to man) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম পুরুষের পক্ষে স্ত্রীই প্রধান উপসর্গ।

আচ্ছা বাইবেল ছাড়িয়া দাও, শুন পুরাণ কি বলিতেছে? সুন্দ ও উপসুন্দ নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের ঘোর অত্যাচারে দেবগণ অতীব বিপদাপন্ন। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল তাহাদিগের অত্যাচারে প্রকম্পিত। দেবসভা হইতে সুন্দ ও উপসুন্দের বিনাশ হেতু তিলোত্তমার সৃষ্টি হইল। উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্তুনিচয়ের তিল তিল লইয়া সেই চারুনিতম্বিনীর সৃষ্টি কার্য্য সমাধা হইল। তিলোত্তমা দেবাদেশে সুন্দ ও উপসুন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন।

তাহার অত্যুজ্জ্বল রূপরাশি নিরীক্ষণ করিয়া তল্লাভে ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে ভয়ানক বিবাদ উপস্থিত হইল এবং সেই বিবাদেই উভয় ভ্রাতা কালকবলে কবলিত হইল। দেবগণের উদ্দেশ্য সফল হইল বম ভোলানাথ!! এস্থলে সামান্য স্ত্রী হইতে দেবত্রাস বীরদ্বয়ের পতন। যুদ্ধার্থ যাহাদের নিকট অগ্রসর হইতে বাসবের হৃদয়েও সাহস হইত না—যাহাদের ভয়ে দেবগণ স্ব স্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, স্বর্গও যাহাদের ভয়ে বিষাদের ঘোর কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহাদের মৃত্যু একটী সামান্যা স্ত্রীলোক হইতে হইল। তাই বলিতেছিলাম উপসর্গের অবয়ব অতি ক্ষুদ্র হইলেও তাহার বল ও বীর্য্য অসামান্য।

ঐ যে অমিততেজা-মধ্যাহ্ন ভাস্কর-তুল্য দৈত্যপতি শুম্ভ সমস্ত সৌর জগৎকে তৃণ তুল্য জ্ঞান করিয়া দেবগণকে স্ব স্ব অধিকারভ্রষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল,

যাহার বীরত্বে ও অত্যাচারে বসুধা টলটলায়মানা, সেই বীরশ্রেষ্ঠ রুদ্রভক্ত দৈত্যপতির কথা কি স্মরণ পড়ে? কি কুক্ষণে পর্ব্বতপার্শ্বে যোগমায়ার মনোমোহিনী মূর্ত্তির কথা শ্রবণ করিয়া দৈত্যরাজ সেই রমণীললাম অম্বিকাকে আনিবার নিমিত্ত চণ্ডমুণ্ডকে প্রেরণ করিলেন। কি কুক্ষণে সেই মহিয়সী শক্তিশালিনী ভগবতীর পাণিগ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে দৈত্যপুঙ্গব বহুবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কি কুক্ষণে সেই জগদারাধ্যা জগজ্জননীর মুখ হইতে নিঃসৃত হইল—"যো মাং জয়তি সংগ্রামে, যো মে দর্পং ব্যপোহতি, যো মে প্রতিবললোকে, স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি।" হায়! কি অশুভক্ষণে সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া দৈত্যাধিপ সমস্ত হারাইয়া স্বয়ং যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সে কথা স্মরণ হইলে এখনও মনে ভয়ের উদ্রেক হয়। সেই অসূর্য্যম্পশ্যা রমণী-হস্তে শুম্ভকে সংসারক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতে হইল। তাই বলি সেই কামিনীই শুম্ভের একমাত্র উপসর্গ।

আই শুন মহাকবি বাল্মিকীর রসময়ী লেখনী নিঃসৃত মহাকাব্যে লঙ্কাধিপের বীরত্বের কথা। জীবকুল-নিসূদন শমন যাহার প্রতাপে কম্পান্বিত-কলেবর হইয়া ভীতি বিতাড়িত কিঙ্করের ন্যায় সতত কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান, দেবগণ যাঁহার ভয়ে অবিরত চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন, সেই স্বর্ণলঙ্কার একমাত্র অধীশ্বর কেবল একমাত্র মৈথিলি রূপ

উপসর্গ যোগে ভবলীলা সম্বরণ করিলেন। দৃষ্টান্ত আর কত দিব? ইতিবৃত্ত ও এ কথারই অনুমোদন করিতেছে। রোমের ইতিহাসের নিকট জিজ্ঞাসা কর,—কেন তাহার গৌরবরবি অসময়ে অস্তাচল চূড়া-অবলম্বন করিয়াছিল—কেন তাহার রাজতন্ত্র-শাসন-প্রণালী অকালে সমূলে উৎপাটিত হইয়াছিল? রোমাধিপতি টার্কুইনের পুত্র সেকসটাস্ কি কুক্ষণে লুক্রেসিয়াকে দর্শন করিয়াছিলেন। পরমাসুন্দরী সীমন্তিনী-ভ্রমে কালকূট-ভরা ভীমভুজঙ্গিনীকে ক্রোড়ে লইয়া মন্মথ-বিদ্ধ তীক্ষ্ণ-শর জালজনিত দারুণ যন্ত্রণার উপশম করিয়াছিলেন। সেই উপসর্গ হইতেই রোমের রাজাদিগের রাজত্বের শেষ হইল। ইতিহাসে এই রূপ দৃষ্টান্ত যে কত আছে তাহা বর্ণনাতীত। পরমাসুন্দরী নুরজাহান রূপ উপসর্গ যোগে সের আফ্গানের অকাল মরণ কি স্মরণ পড়ে? পরমারূপসী চারু নিতম্বিনী হেলনা তীক্ষ্ণ বিষ-বল্লীর ন্যায় দংশন করিয়া ট্রয়ের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন। তাই বলিতেছিলাম, এ সংসারক্ষেত্রে রমণীই মানবের প্রধান উপসর্গ। আবার একথাও সত্য যে রমণীই এই সংসারাকাশের একমাত্র পৌর্ণমাসী-চন্দ্রিমা, এই বিশাল সংসার মরুভূমির একমাত্র মরূদ্বীপ (ওয়েসিস)। সীমন্তিনীই মানবজীবনের একমাত্র আশাপ্রদীপ,—শান্তির উৎস এবং আনন্দের খনি। ইহাকে যে উপসর্গ মনে করে, সে মূর্খ।

তৃতীয় কাণ্ড।

[illegible]

ঐ যে গৌরাঙ্গ যুবা পুরুষটী আজি সম্মানের সহিত ইউনিভারসিটির গাউন পরিধান করিয়া—বক্ষঃস্থল বিস্ফারিত করতঃ জনপ্রবাহের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, যাহার আকৃতি দেখিয়া মনে হয়, সাহস, উৎসাহ, বল ও বীর্য্য সমস্ত গুণই যেন একাধারে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, কাহার প্রসাদে তিনি ইউনিভারসিটির খ্যাতাপন্ন কৃতীসন্তান হইয়াছেন? দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া নবীন সংসারী শতদলবাসিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাতেই শ্বশুরের প্রচুর অর্থব্যয়ে ইউনিভারসিটি হইতে শেষ ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইয়াছেন। লোহিতাক্ষ বাবু উৎকৃষ্টরূপে শিক্ষিত হইয়া ইউনিভারসিটির শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। হইতে পারে, এ সংসারে একজনের পক্ষে যাহা উপসর্গ, অপরের পক্ষে তাহাই তাহার উন্নতির সোপান। লোহিতাক্ষ বাবু শুভক্ষণে শুভলগ্নে শতদলকে বিবাহ না করিলে, দরিদ্রতার কশাঘাতে চিরদিনের তরে তাঁহাকে অশিক্ষিত অবস্থায়

কালাতিপাত করিতে হইত। কে তাঁহার সৌরভ গ্রহণ করিত? কিন্তু ভাগ্যক্রমে মাহেন্দ্রক্ষণে শতদলবাসিনীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তাহাতেই কন্যাবান শিব বাবুর কোষাগার রীতিমত অর্থবর্ষণ করিয়া লোহিত বাবুর প্রতিভা-কুসুমকে বিকশিত ও সভ্যজগতের উন্মীলিত করিয়াছে তবু কি বলিবে স্ত্রীই উপসর্গ? লোহিত বাবুর যে কিছু উন্নতি হইয়াছে, সে সমস্তের মূলে আমরা মহা-শক্তি অন্নপূর্ণার শক্তি বিশেষ নিহিত দেখিতে পাই। শত-দলবাসিনী'র কৃপাতেই শতদলবাসিনী লোহিত বাবুর পানে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। এইত হইল একপক্ষের কথা। শিববাবুর কথাটা একটুক্ চিন্তা করা যাউক। পঞ্চানন তলার শিব বাবু এক বিবাহেই শ্মশানবাসী শিব হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বিবাহের সময় লোহিত বাবুর পিতা নিজের কুলমানমর্য্যাদা অনুসারে শিব বাবুর কোষা-গারের তিন চতুর্থ অর্থ নিজ-গৃহলক্ষ্মীর অঙ্কশায়ী করিয়াছিলেন। যে এক চতুর্থ অবশিষ্ট ছিল, তাহা লোহিত বাবুর শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত হইয়াছে। এই-ক্ষণ শিব বাবু বম্ ভোলানাথ! তাই বলি বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুভদ্রলোকের কন্যা এক প্রধান উপসর্গ। অন্দরে অরিষ্ট-গৃহে প্রসূতি প্রসব যাতনা ভোগ করিতেছেন, আর বাহির খণ্ডে বাড়ীর কর্ত্তা ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছেন— কেবল আদ্যাশক্তির নিকট কায়মনবাক্যে প্রার্থনা করিতে-

ছেন—মাতঃ আর যেন কন্যাদায়ে পড়ি না; আর যেন কন্যাভাবে ক্লিষ্ট হই না। ঠিক কথা, আমাদের সমাজের দুর্গতি দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে এই প্রার্থনাই স্বাভাবিক। হায়! কি পরিতাপের বিষয়! যে জীব কন্যাবিবাহের নিদারুণ ভাবে ক্লিষ্ট হইয়া ভগবানের নিকট কন্যা না হওয়ার প্রার্থনা করেন, সে জীব মৃত কি জীবিত তাহা সহজেই অনুমিত হয়। যিনি যতই কেন শিক্ষিত হউন না, যতদিন পর্যন্ত আমাদের এই উপসর্গ সুচিকিৎসকের চিকিৎসায় বিদূরিত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত আর আমাদের কল্যাণ নাই। বিবাহের বাজারে পাশকরা ছেলের দর ক্রমশঃ যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে বোধ হয়, অনেকেই অচিরে কন্যাহন্তা বা আত্মহত্যাকারী হইয়া দাঁড়াইবেন। সেই জন্যই বলি, ভাই! এখনও সময় আছে, সমাজের গায়ে অস্ত্র চিকিৎসা করিয়া তাহার ভীষণ ব্যাধি আরোগ্য কর। কেবল টাকে উপাধি গুঁজিলে কি হইবে? এক সময়ে যে গৃহ-সরোবরের ফুল্ল-কমলিনী, পিতার হৃদয়াকাশের সুখতারা জননীর আশা-কুসুম, সহোদরের শান্তিনিকেতন বলিয়া পরিগণিত ছিল; সেই কিনা কালবশে আমাদের অর্থ-পিপাসারূপ দারুণ-দোষে বর্তমান সময়ে গৃহসরোবরের শৈবাল, পিতার হৃদয়াকাশের মঘা নক্ষত্র, জননীর নিরাশার প্রতিমূর্তি, সহোদরের অশান্তির আলয় ও সর্বোপরি কোষাগারের শনিস্বরূপ হইয়া

দাঁড়াইয়াছে। এইস্থানে একটী দৃশ্যের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে। সেই দৃশ্যের কথা পাঠকের নিকট না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। একসময়ে আমরা কয়েকজন একত্র হইয়া কলিকাতার একটি প্রসিদ্ধ বারোয়ারী দেখিতে গিয়াছিলাম। বারোয়ারীর উপাস্য দেবতার কিঞ্চিৎ দূরে একটী অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া অবাক্ হইলাম। একটী বিবাহের সভামূর্ত্তিতে অঙ্কিত হইয়াছে। বর বিবাহ করিতে বসিয়াছেন, কন্যা সভায় আনীতা হইয়াছে। এমন সময়ে বরের পিতা কন্যার পিতার নিকট বলিলেন, কৈ? আমার পুত্রকে ওজন করিয়া আমাকে টাকা দাও। চুক্তিভঙ্গ করিতেছ কেন? দেখিলাম চিত্রকর মানদণ্ডের একপার্শ্বে কন্যাকর্ত্তার যথাসর্ব্বস্ব ও অপর পার্শ্বে উপবিস্ট বরের একখানি পদমাত্র অতি কৌশলে স্থাপন করিয়া দেখাইতেছেন যে কন্যার পিতার সর্ব্বস্ব বরের একখানি পদের ও সমান হইল না। তখন কন্যার পিতা অত্যন্ত ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, গৃহিণীকে টানাটানি করতঃ গৃহের বাহিরে আনিয়া, সংস্থাপিত যথাসর্ব্বস্বের পার্শ্বে বসিতে বলিতেছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া আমার যুগপৎ হাসি ও কান্না আসিল। কি সর্ব্বনাশ!! চিত্রকর সমাজের অবস্থা অতি সুন্দররূপ চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার নির্ম্মিত মূর্ত্তিগুলি নির্ব্বাক হইলেও যেন পরিষ্কাররূপে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজকে লক্ষ্য করিয়া—শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর বুকে ছুরি মারিয়া সকলকে

তারস্বরে এই কথা বলিতেছেন, যতদিন বঙ্গে এইরূপ পাশ্রুকরা ছেলের দর থাকিবে, ততদিন বঙ্গ শ্মশান-ক্ষেত্র, ইহার অধিবাসীরাও মৃত।

বঙ্গীয় ভ্রাতৃগণ! তোমরা ইউনিভারসিটির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া যতই কেন গৌরব করনা, কমলা যতই কেন তোমাদের কোষাগার পূর্ণ করিয়া রাখুন না, তোমাদের সমাজের এই গুরুতর ব্যাধির চিকিৎসা না হইলে—সকলে বদ্ধ-পরিকর হইয়া ভীষ্মের ন্যায় প্রতিজ্ঞা-পালনে যত্নবান না হইলে, তোমাদের আর নিস্তার নাই। তোমাদের সভ্যতা ও উদারতা কি কেবল বক্তৃতায় পর্য্যব-সিত হইবার জন্য? নিশ্চয় জানিও তোমরা অমঙ্গলের স্রোত প্রবাহিত করিবার নিমিত্ত নিজহস্তে পয়ঃনালী প্রস্তুত করিতে বসিয়াছ? শক্তি আমাদের উপাস্যদেবতা—শক্তি আমাদেয় মূলমন্ত্র—শক্তিই আমাদের গৃহলক্ষ্মী। শক্তি ব্যতিরেকে পুরুষ শবমাত্র। আবার শক্তিযোগে শবই শিব হয়। আমরা যেরূপ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, তাহাতে পদে পদে শক্তির অবমাননা করা হইতেছে। তান্ত্রিকের নিকট স্বয়ং ভগবতীই কুমারীরূপে উপস্থিতা ইহা তোমাদের চিন্তা করা কর্ত্তব্য। ঐ দেখ তোমাদের কুলীন ব্রাহ্মণেরা কি ভয়ঙ্কর পৈশাচিক ব্যাপারে লিপ্ত রহিয়াছেন। ত্রিংশ বর্ষ-বয়স্কা কন্যা পিতৃগৃহে অবিবাহিতা অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছে; আর সংগোপনে * * * * আর বলিতে

পারি না বলিতে লজ্জা হয়। তোমরা আমাদের আশা ভরসা, তোমরা বঙ্গের ভাবী উন্নতির সোপান। তোমরা কি প্রক্ষণে এই সকল বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া গৃহের মধ্যে নানাপ্রকার ব্যভিচারকে ফল্গুনদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতে প্রশ্রয় দিবে? বাস্তবিক যদি তোমরা সমাজের ঐ সকল উপসর্গ অচিরে বিনাশ করিতে অগ্রসর না হও, তবে তোমাদের শিক্ষায় ধিক্। দীক্ষায় ধিক্! মানে ধিক্! কুলে ধিক্! তোমরা অসভ্য জুলু ও কুকি হইতেও নিকৃষ্ট। তোমাদের পাঁজি পুঁথি কর্ম্মনাশার অতল গর্ভে ফেলিয়া দিয়া নাকে শর্ষপ তৈল প্রদানে সুখে পর্য্যঙ্কে নিদ্রা যাও, আর বঙ্গভূমি মহাশ্মশানে দগ্ধ হইতে থাকুক।



চতুর্থ কাণ্ড।

—•※—

অর্থ অনর্থ কবহি জাত নাহি। সেঁইছ মন গ্রথ লোপে নাহি।
যাকো ধন তাকে ভয় অধিকা। ধন কারণ মারত পিতু লাড়কা। কবির।

সংসারে কামিনী যেমন একটা উপসর্গ, কাঞ্চনও তাহা হইতে ন্যূন নহে। এই কামিনী-কাঞ্চনই সর্ব্বনাশের মূল। সেই জন্যই বোধ হয়, আধ্যাত্মিক জগতের একটা বীর কেশরী একদা অতিগম্ভীরস্বরে শিষ্য মণ্ডলীর মধ্যস্থল বিকম্পিত করিয়া বলিয়াছিলেন, "যদি ঈশ্বর চাও, তবে কামিনী-কাঞ্চন পরিত্যাগ কর।" আচ্ছা, আধ্যাত্মিক জগতের কথাও ছাড়িয়া দাও। একবার জগতের ইতিবৃত্তের দ্বারে করাঘাত করিয়া খুলিয়া দেখ, তমোময় অতীতের গর্ভে কাঞ্চনের মহিমা কতদূর পর্য্যন্ত শোণিতাক্ষরে বসুন্ধরা-ললাটে লিখিত রহিয়াছে। দৃষ্টান্তের জন্য বিদেশের ইতিবৃত্তের মুখাপেক্ষী হওয়া নিষ্প্রয়োজন। ভারত ইতিহাসেই ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। এই ভারতবর্ষ যদি সাহারা মরুভূমির ন্যায় বালুকাপূর্ণ প্রান্তর হইত— যদি কন্যাকুমারী হইতে হিমাদ্রি পর্য্যন্ত—সিন্ধু হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত কেবল বালুকা-সমুদ্র হইত, সংক্ষেপে বলি, যদি ভারত-জননী সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা না হইয়া

সার অনুর্ব্বর ক্ষেত্রময়ী হইতেন, তাহ'লে কি বৈদেশিক স্যু-নিকর কখনও ভারতমাতার বক্ষঃস্থল তদায় সন্তান-শাণিতে প্লাবিত করিত! তাহ'লে কি গজনি-কুল-কলঙ্ক আর্য্যসন্তানের উপাস্য সোমনাথের মূর্ত্তি ভগ্ন করিয়া দস্যুর ন্যায় তাহার বিপুল অর্থরাশি আত্মসাৎ করিত? তাহ'লে ক "ঘোর"-কুলপামর ভারত-জননীর যোগ্যপুত্র পৃথ্বিরাজের শাণিতপাত করিয়া ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র সন্নিধানে 'ত্রেওরিক্ষেত্রে" স্বার্থযজ্ঞের পূর্ণাহুতি প্রদান করিত? তাহ'লে কি "পাণিপথ" সমরপ্রাঙ্গণ মোগল, পাঠান, সুর ও মহারাষ্ট্রীয় শোণিতে কখন বিধৌত হইত? ভারতের অপর্য্যাপ্ত অর্থ-কাহিনী পৃষ্ঠে করিয়া জগৎপ্রাণ জগতের সকলের নিকট ঘোষণা করিয়াছিল বলিয়াই, নাদির ও আহম্মদসাহ প্রভৃতি সকলেই ভারত আক্রমণ করিয়া নিজের বীরত্বের বার্ত্তা ইতিবৃত্তের পক্ষপুটে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

স্বর্ণময়ী ভারতভূমি যদি অনুর্ব্বর শিরক্কো-প্রবাহিত বালুকাপূর্ণ প্রান্তর হইত, তবে কি পর্টুগীজ-কুল-তিলক ভাস্কোডিগামা ইহার পথ অনুসন্ধানের জন্য অমানুষিকী যাতনা ও অভাবনীয় কষ্ট স্বীকার করিতেন? মা! ভারত-জননি! তোমার অপার ঐশ্বর্য্যের সংবাদ যদি সভ্যজগতে প্রচারিত না হইত, যদি চতুর্দ্দিকে যশের ভেরী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বলিয়া তোমাকে বিঘোষিত না করিত, তবে আমরা

বলিতে লজ্জা হয়—অন্নাভাবে কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়া অসময়ে বিনারোগে এত সংখ্যক ইহলোক পরিত্যাগ করিতাম না।

বলিতে লজ্জা হয়,—ধনধান্যপূর্ণা ভারতমাতার সন্তান হইয়া পুনঃ পুনঃ অনাহারে মুষ্টিমেয় অন্নাভাবে জীবন বিসর্জ্জন দিতে বসিতাম না। তাই অতি দুঃখে ও গভীর বিষাদে বলিতেছিলাম, ভারতের অর্থই অনর্থের মূলীভূত কারণ। কেবল ভারত বলিয়া নহে এই সাধারণ নিয়ম সর্ব্বদেশেই পরিলক্ষিত হয়।

হিমাদ্রি! তুমি পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ, জগতে তোমাপেক্ষা উচ্চাচল আর নাই। তাই একদিন মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভব কাব্যের আরম্ভে তোমাকে লক্ষ্য করিয়া মহ গীতি গাহিয়াছিলেন। তুমি স্বয়ং ভারতের উত্তর দুয়ার আগুলিয়া ভারতমায়ের কোষাগার রক্ষা করিতে লিপ্ত থাকিয়াও রক্ষা করিতে পারিলে না। তুমি অটুট, অচল ও নির্ভীক, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! হিমাচল যাহার উত্তর দুয়ারে প্রহরী, গম্ভীর জলধি যাহার দক্ষিণ দুয়ারের প্রহরার কার্য্য করিতেছেন, তাঁহার ভাণ্ডার উন্মুক্ত-মুখ কর্পূর-পূর্ণ পাত্রের ন্যায় এক্ষণে সম্পূর্ণ শূন্য।

সংক্ষেপে বলি, সংসারের প্রতি একবার দৃষ্টি কর। পুত্র অর্থলোভে পিতৃহত্যা মহাপাপে প্রায়ই লিপ্ত হইতেছে। অর্থ, স্নেহের-পুতুল ভ্রাতৃগণের মধ্যে অবিরাম বিবাদ

বিসম্বাদ আনিতেছে। অর্থলোভে স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। অর্থের জন্য জন-পূর্ণ সহর, গ্রাম, পল্লী; নরশোণিতে প্লাবিত হইতেছে। হে রজতময়ি মুদ্রে! তোমার কি মোহিনীমূর্ত্তি—তোমার কি অদ্ভুত শক্তি—তুমি না করিতে পার এমন কিছুই নাই। তুমি মহাশ্মশানকে রাজনিকেতন ও অমরাপুরী সদৃশ নৃপতি-ভবনকে মহা-শ্মশানে পরিণত করিতে পার। তুমি অশীতিবৎসর বয়স্ক স্থবিরকে দশমবর্ষীয়া বালিকার সহিত মিলাইয়া দিতে পার। তুমি সন্তানের হৃদয়-ক্ষেত্রস্থ স্বাভাবিকী ভক্তিনদী শুষ্ক করিয়া তৎস্থানে দস্যুর প্রকৃতি ও দানবশক্তি আনিয়া ঢালিয়া দিতে পার। তুমি কুরূপকে সুরূপ,—নির্ব্বোধকে বুদ্ধিমান ও মূর্খকে পণ্ডিত করিতে পার। তুমি সূর্য্যকে পশ্চিম হইতে উদিত ও লবণ-সমুদ্রকে ক্ষার-সমুদ্রে পরিণত করিতে পার। তোমারই জন্য গৃহস্থ প্রত্যেকে গৃহ কর্ত্তার অধীন হইয়া থাকে। আবার তুমি যখন কর্ত্তার বাক্স হইতে অন্তর্হিত হও, তখন প্রাণেভ্যঃ প্রিয়তমা পর্য্যন্ত সেই কর্ত্তার কথা শুনিয়াও শুনেন না,—দেখিয়াও দেখেন না—নিকটে যাইয়াও যান না। এমন কি দৈনিক আহার দিতে পর্য্যন্ত ত্রুটী করেন।

কর্ত্তা—যিনি একদিন গৃহিণীর হৃদয়াকাশে শুক-তারা—বিমলানন্দের অক্ষয়-উৎস—পার্থিব সুখের একমাত্র কেন্দ্র—শান্তি-সরোবরের লোচন-তৃপ্ত মরাল-কুলাবতংস

ছিলেন, তিনিই সশরীরে বর্ত্তমান থাকিয়াও প্রিয়জনের নিকট—স্বীয় অন্নে প্রতিপালিত ব্যক্তিগণের নিকট এমন কি, সেই সহধর্ম্মিণীর নিকট তোমারই অভাবে হে মুদ্রে! অশুভ মঘা ও অশ্লেষা নক্ষত্রবৎ-নিরানন্দের প্রস্রবণ—অসুখের একমাত্র নিদান ও অশান্তির একমাত্র হেতু হইয়া দাঁড়ান।

সংক্ষেপে বলি, যদি স্মৃতিরূপ বর্ত্তিকা হস্তে করিয়া অতীত জগতের তমসাপূর্ণ কক্ষমধ্যে প্রবেশ কর, তবে দেখিতে পাইবে কুরুক্ষেত্র, ট্রয়, থর্ম্মাপালী, মেরাথন, এজিন কোর্ট, রামিলিস, ওয়াটলু প্রভৃতি যে সকল সমর-উচ্ছ্বাসে জগৎ বিক্ষোভিত ও শোণিত প্রবাহে বিধৌত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশের মূলেই কামিনী কিম্বা কাঞ্চন অলক্ষ্যভাবে সূক্ষ্ম সূত্র ধরিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। যাক—ও সব কথায় আর কাজ কি? যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে।



পঞ্চম কাণ্ড।

যব মঁ হিথা তব গুরু নাহি আব গুরু হ্যায় হাম নাহি।
প্রেমগলি অতি স, কবি তা'মে দোনাস, মাহি॥ কবীর।

এই সংসারে "আমি" এই শব্দটীই একটী ভয়ানক উপসর্গ। ভবব্যাধি এই "আমি" উপসর্গযোগে দুরারোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। অস্মদ শব্দরূপ ভীষণ উপসর্গ প্রকোপে ভবরোগ ক্রমশঃই বৰ্দ্ধিত হইয়া জীবকুলকে অবিরত আকুলিত ও আন্দোলিত করিতেছে। এই উপসর্গটির অবয়ব অতি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার অপরিমিত তেজপ্রভাবে জগৎ যেন কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। গৃহস্বামী নিজের ভবন-সিংহাসনে সতত আসীন হইয়া দিবানিশি কেবল কুলিশোপম গম্ভীর নিনাদে পরিবারস্থ সকলকে বিশেষতঃ সেবকদলকে বাতাভিহত কদলীর ন্যায় প্রকম্পিত করতঃ যেন সিজর কিম্বা আলেকজান্দারের যশশ্চন্দ্রিমাকে কবলিত করিয়া ফেলিতেছেন! এই "আমি" উপসর্গের যোগেই বাসব-সদন-সদৃশ সংসার-ভবন অতি দুঃখের ও বিষাদের লীলাভূমি হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত সংসার একত্র হইয়াও যেন আমার ও তোমার মধ্যে যে ভয়ানক বাড়বাগ্নিপূর্ণ মহাসমুদ্র অবিরত গর্জ্জন করিয়া প্রবাহিত

হইতেছে,—কালসমুদ্রে তুমি ও আমিরূপ দ্বীপদ্বয়ের মধ্যে প্রবাহিত খরস্রোতাবিশিষ্ট যে পয়ঃপ্রণালী অবিরাম তরতর বেগে চলিতেছে তাহার উপর সেতুবন্ধন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। এই ভেদ সমুদ্রের অতলগর্ভে জীবনিচয়ের সমস্ত সুখের নিদান কালবশে ক্রমশঃই বিসর্জ্জিত হইতেছে। তাই বলি যদি ভবরোগের সুচিকিৎসা করিতে চাহ—যদি সংসার ব্যাধির মূলে কুঠারাঘাত করিতে বাঁসনা কর—তবে অনন্ত ব্রহ্মসত্তারূপ মহাসমুদ্রে এই "আমি" টুকুকে ডুবাইয়া ফেল। ব্রহ্মসাগরের মধ্যে "আমি"রূপ বরফ টুক্‌রাকে ফেলিয়া দেও। দেখিবে সংসার কেমন সুখের আলয় ও প্রীতির ভবন হইয়া উঠিবে। এই "আমি" উপসর্গের প্রবল প্রকোপ হেতুই সিজর ও পাম্পের অকালে পতন হইয়াছিল। এই "আমি" উপসর্গের আবির্ভাব হেতুই কুরুকুল সমরে নিহত হইয়াছিল। ভবরোগের প্রধান উপসর্গ "আমি" হেতুই কর্সিকা দ্বীপের খর্ব্বাকৃতি বীরপুঙ্গবের শেষ জীবন অতি কষ্টে বিদূর সেণ্টহেলেনায় অতিবাহিত হইয়াছিল। যাহার দুর্দ্দম অপরিমেয় প্রভাব তপনের প্রখর কিরণ সমস্ত ইউরোপখণ্ডকে উত্তপ্ত করিয়াছিল—যাহার প্রতাপ-সূর্য্য একদিন মধ্যগগনে অবস্থিতি লাভ করিয়া তুষারাবৃত ধবল দ্বীপকে প্রজ্জ্বলিত হুতাশন বিদগ্ধ কাননের ন্যায় করিয়া তুলিয়াছিল—যাঁহার তেজ ও বীরত্বের নিকট সমস্ত ইউরোপ বিনতমস্তকে একদিন দণ্ডায়মান হইয়াছিল, সেই

বীরদম্ভ নেপোলিয়ান কেবল "আমিত্বের" প্রভাবেই মধ্যাহ্নে সূর্য্যগ্রহণবৎ অসময়ে ওয়াটর্লু ক্ষেত্রে ওয়েলিংটন বাহু কর্ত্তৃক কবলিত হইলেন। আমি সর্ব্বেসর্ব্বা—এই জ্ঞান তাঁহাকে সোতরোগের রোগীর ন্যায় অতদূর স্ফীত না করিলে, কখন এত সকালে তাঁহার বিনাশ হইত না। আর কি বলিব, এই আমিত্বের প্রভাবেই জগতে যত প্রকার অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, এরূপ আর কিছুতেই হইতেছে না। তাই বলি "আমি" সংসার কাননের বিষবৃক্ষের বীজস্বরূপ। জীবিত থাকিতে যে "আমিত্ব" সংসারে রাজত্ব করিতেছে,—মরণে যে "আমিত্বের" ছায়া মহাশ্মশানে নীত হইয়া আত্মীয় বন্ধুবান্ধব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও ভস্মীভূত হইতেছে—যে "আমিত্বের" গুরুভারে সংসার যেন নমিয়া পড়িয়াছে। সেই "আমিত্বই" ভবরোগের মূল উপসর্গ। তাই বলি মা! কৃপা করিয়া এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতমের "আমিত্বকে" তোমার সত্তাসাগরে ডুবাইয়া দাও—এই নগণ্যের আমিত্বকে সমূলে বিনাশ কর, অথবা এই সংসার আমিময় করিয়া "তুমিত্বের" অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া দাও। বিশ্বেশ্বরি! বিশ্বজননি! কি বলিব তোমার করুণা ব্যতিরেকে কাহার সাধ্য সেই বঙ্কিম গ্রীব "আমিত্বকে" সম্মুখ সমরে বিনাশ করিতে পারে? জগতে এইরূপ বীর কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই—যে সেই আমিত্বের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিতে পারে! শত সহস্র গ্যারিবল্ডী

সহস্র সহস্র ম্যাটসিনী, লক্ষ লক্ষ ওয়ালেস্ ও প্রতাপসিংহ একত্রিত হইয়াও যাহার নিকট দণ্ডায়মান হইতে সাহস পায় না—কোটি কোটি আলেকজান্দার, হানিবল, সিজর ও ওয়েলিংটন যাহার নিকট অবনত মস্তক ; মা! তোমারই কৃপায় সেই অমিত তেজপূর্ণ "আমিত্ব" যোগী-জন-বল্লভ নীলকান্তের নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত ও শৃঙ্খলিত—সামান্য কুলসম্ভব প্রকৃতি তনয় যিশুর নিকট প্রভুভক্ত সারমেয়ের ন্যায় সতত দণ্ডায়মান।





কাণ্ড।

—ঃ*ঃ—

ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহ সমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ ॥—চণ্ডী।

বর্ত্তমান যুগে ভারতের কোন না কোন স্থানে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ লাগিয়া রহিয়াছে। তাই আজি এই কাণ্ডে ভারতবর্ষের প্রধান উপসর্গ দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসের গুটিকত কথা বলিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির কলেবর কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিলাম।

যে দেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং অন্নপূর্ণা—সেই দেশ আজ অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে—আজ অন্নপূর্ণার ঘরে অন্ন নাই, তাই তাঁহার সন্তান-সন্ততি ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, বিদেশীর পদে দলিত হইতেছে—কত লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহ্য করিতেছে—তাহা এ লেখনী লিখিতে অসমর্থ।

যতপ্রকার ব্যাধি দেশকে মহাশ্মশানে পরিণত করিতেছে—দুর্ভিক্ষ-রাক্ষস তাহাদের কাহারও অপেক্ষা কম নহে। উত্তরে হিমাদ্রি হইতে আরম্ভ করিয়া কন্যা অন্তঃরীপ পর্য্যন্ত,—সিন্ধু হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সীমাবচ্ছিন্ন স্থান এই রাক্ষসের কবলে প্রায় প্রতি বৎসরই এতাধিক পরিমাণে কবলিত হইতেছে যে—তাহা ভাবিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়।

যে গৃহে অন্নপূর্ণা স্বয়ং অন্ন বিতরণ করিতে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন—অবকাশ পাইতেন না—সেই গৃহের অধিবাসীরা আজ অন্নাভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়িয়াছে। যে গৃহে অতিথি কোন দিন বিমুখ হয় নাই সেই ভারত-গৃহে আজ "হা অন্ন, হা অন্ন" রূপ হৃদয়ভেদী ভীষণ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইয়া সমস্ত জগৎকে দুঃখে বিক্ষোভিত করিতেছে। যে ভারতে অন্নপূর্ণা একমুষ্টি অন্ন দ্বারা সহস্রাধিক শিষ্যসমন্বিত ঋষিপুঙ্গবকে পরিতুষ্ট করিয়া অতিথি সৎকারের পরাকাষ্ঠা জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছেন—সেই ভারত আজ নিজের সন্তান-সন্ততির মুখে অন্ন দিতে না পারিয়া পরের মুখাপেক্ষী হইয়া অশ্রুজলে ভাসিতেছেন। সন্তান ক্ষুৎ-পিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া যখন মাতার নিকট "অন্নং দেহি, অন্নং দেহি" বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করে তখন মাতা অনন্যোপায় হইয়া 'হা হতোস্মি' বলিয়া নীরবে চক্ষুর জলে বক্ষ ভাসাইয়া ফেলেন। যিনি সমস্ত প্রাচীন ও নূতন মহাদ্বীপের একমাত্র অন্নদায়িনী—বিশ্বেশ্বরী অন্নপূর্ণারূপে স্বহস্তে অন্ন বিতরণ করিয়া সমস্ত জগৎকে প্রতিপালন করিতেছিলেন—তিনিই আজি জগৎ দূরের কথা—নিজের সন্তান-সন্ততি কয়েকটীকে অন্ন দিয়া বাঁচাইতে অক্ষম।

ঐ দেখ কত লোক অন্নাভাবে কেবলমাত্র কচু ঘেঁচু সিদ্ধ করিয়া উদরানলের আহুতি দিতেছে, কত শিশু

মাতৃস্তনে দুগ্ধ না পাইয়া অকালে কালকবলে প্রবেশ করিতেছে, কত জনপদ একেবারে দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসের হস্তে পড়িয়া জনশূন্য নরকঙ্কালে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তাহা ভাবিলেও হৃদয়তন্ত্রী বিষাদে নিশ্চল হইয়া পড়ে। তাই বলিতেছিলাম, আজকাল দুর্ভিক্ষও এ দেশের পক্ষে একটী ভীষণ উপসর্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তুমি কি বলিতে চাও সুফলা-ভারত-কমলা আজ অফলা হওয়া নিবন্ধন এই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে? ভারত-জননীর স্তন্যসম শস্যের অপ্রচুরতাপ্রযুক্তই কি আমরা দুর্ভিক্ষের হস্তে এত নাস্তা-নাবুদ হইয়া পড়িয়াছি? কখনই নহে। ভারতের শস্য রাশি অর্ণবপোতে দূর দূরান্তর গায়েনা ও জামেকা প্রভৃতি স্থানে চলিয়া যাইতেছে, সমস্ত পৃথিবীতে রপ্তানী হইতেছে আর, যে দেশের শস্য, সেই দেশে দুর্ভিক্ষানল জ্বলিয়া উঠিতেছে—সেই বহ্নিতে পতঙ্গপালের ন্যায় ভারত-সন্তানগণ আত্মবিসর্জ্জন করিতেছে। ভারতের উৎপাদিকা শক্তির ব্যাখ্যা জগৎ-ইতিবৃত্তে একস্বরে বহুদিন হইতে গাহিয়া ভারতকে শীর্ষস্থান দিয়াছিল, আজ সেই ভারত নরকঙ্কালে সঙ্কীর্ণতা লাভ করিয়া অগম্য হইয়া উঠিয়াছে। যে দেশের পক্ষে দুর্ভিক্ষ কথাটা কেবলমাত্র অভিধানের মুখে শুনিতে পাওয়া যাইত—সে দেশে কালক্রমে অবিরাম দুর্ভিক্ষাগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে। আর তাহার অধিবাসী-গণ সেই অনলে পতঙ্গপালের ন্যায় জীবন বিসর্জ্জন

দিতেছে। তাই বলি ভাই একবার কি ভাবিয়া দেখনা আমাদের ললাটে বিধাতা কেন এই ভীষণ ব্যাধির তাণ্ডব নৃত্য লিখিয়াছেন! শিক্ষিত বণিক সম্প্রদায়! একবার মূহুর্ত্তের জন্য ভাবিয়া দেখ, দেশের শস্য বিদেশে রপ্তানীই এই রোগের মূল। তোমরা যদি সকলে একবাক্যে এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কর, আমরা স্বর্ণমুষ্টির বিনিময়ে কখন ধূলি-মুষ্টি লইব না—চিন্তামণির পরিবর্ত্তে কাচখণ্ড গ্রহণ করিব না—ধান্যের বদলে বালির আমদানী করিব না,—তাহা হইলে অচিরে দুর্ভিক্ষ-রাক্ষস নিশ্চয়ই দূর দূরান্তরে পলায়ন করিবে। ভারতের দুর্ভিক্ষ তাড়াইতে অধিবাসীগণের অধিক কষ্ট পাইতে হয় না, একটুকু বুঝিয়া চলিলেই সব শোধরাইয়া যায়। শ্বেত সর্ষপ ছড়াইয়া যেমন সাধকগণ ভূমি সংস্থিত তাল বেতালগণকে নিষ্কাসিত করেন, সেইরূপ তোমরা যদি সকলে মিলিয়া ব্যবসায়ে ঐরূপ কার্য্য করিতে পার, তবে আর দুর্ভিক্ষ কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে?



সপ্তম কাণ্ড।

—*:o:*—

"সাচ্ কহে তো মারে লাট্টা ঝুঁটা জগত ভুলাই।" - কবির।

ইংরেজ কবি আলেকজান্দার পোপ সত্যই বলিয়াছেন—

"All seems infected that the infected spy,
As all looks yellow to the jaundiced eye."

তাই ভাবি কি ন্যেবার ব্যারাম হইল ? চতুর্দ্দিকেই কেবল উপসর্গই দেখি—ভালতেও মন্দ দেখি। কাহার কাছে যাই—রোগের কারণ নির্ণয়ের নিমিত্ত কাহার শরণাপন্ন হইব ? সমালোচকগণ কলম উঠাইয়া বসিয়া আছেন—যখনই পুস্তকখানি তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইবে, তখনই তাঁহারা মনের ঝাল উঠাইয়া লইবেন। যাহা হউক এতদূর অগ্রসর হইয়া এক্ষণে পশ্চাদপদ হওয়া অবৈধ। তাই আজ আবার লেখনী ধারণ করিলাম। প্রায় প্রত্যেক আপিসেই—প্রত্যেক বিভাগেই বর্ত্তমান সময়ে উপসর্গের প্রবল প্রকোপ দেখিতে পাই। তুমি ভাই ! আপিস বিশেষের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছ—তাই তুমি তোমার সপ্তম পুরুষের অতীত জ্ঞাতির আত্মীয় স্বজনকে দুর দূরান্তর হইতে আবাহন করিয়া আনিয়া ক্রমশঃ আপিসটী পরিপূর্ণ করিয়াছ। ক্ষুদ্র পদাতিক বেষ্টিত

কিস্তীপিল সমন্বিত দাবার রাজার ন্যায় নিজের আসরে বলীয়ান হইয়া অবস্থান করিতেছ—কতশত মুরুব্বিবিহীন উপযুক্ত লোকের প্রকৃত দাবি ও দাওয়া পদতলে দলিত করিয়া কর্ণে জপার অভিনয় দেখাইয়া নিজের বিদ্যাদিগ্‌গজ আত্মীয়গণকে পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছ। তোমার এমনই বসাইবার ও বসিবার কায়েদা যে, কে তোমাকে মাৎ করিতে পারে? তোমার আত্মীয়-স্বজনরূপ ভীমবপ্র কাহার সাধ্য ভেদ করিতে পারে? শত সহস্র লর্ড কম্বর-মিয়র একত্রিত হইলেও তোমার কূটনীতিরূপ ইষ্টকচূর্ণ দ্বারা গ্রথিত দুর্ভেদ্য দুর্গ বিদ্ধ করিতে অসমর্থ। বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার তোমার নিকট হার মানিয়াছে। তোমা হইতে অধিকতর জ্ঞানী ও বিদ্বান্ উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি তোমার অধীনে কোন কর্ম্ম প্রার্থনা করিলে তুমি অগাধ বুদ্ধিবলে, "হুজুরকে" কূটনীতি-জালে আবদ্ধ করিয়া তাহার দাবি অগ্রাহ্য করতঃ দূরে নিক্ষেপ করিতে সতত প্রস্তুত। তোমার মোলায়েম কথা শুনিয়া ধর্ম্মাবতার অধর্ম্মের অবতার হইয়া তাহার আবেদন পত্রে "too big for the post, wo'nt stick" বলিয়া মন্তব্য পাস করিলেন। হায় হায়!—উচ্চ-শিক্ষালব্ধ উদরান্নের সংস্থান হেতু ইতস্ততঃ পরিচালিত যুবক শিরে করাঘাত করতঃ তোমার ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়ার মর্ম্মভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া চলিয়া গেল। যে ব্যক্তি মিল, হার্ব্বার্ট স্পেনসারের

সূক্ষ্মযুক্তির মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছে, সেই আজ তোমার কূটবুদ্ধির মধ্যে প্রবেশ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। তোমার বুদ্ধি ও নীতিকে বলিহারি যাই। তোমার মায়াময় আবরণ ভেদ করিবার কেবল একই মাত্র উপায় এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। যদি হাইড্রোজেন রূপ তোষামোদজনক বচন, অক্সিজেনরূপ তোমার বাসায় সর্ব্বদা গমনের সহিত রাসায়নিক সংযোগ করা যায়, তাহা হইলে বোধ হয়, তোমার মায়াময় আবরণ ধুইয়া যাইতে পারে। তাহাও সন্দেহজনক। কিন্তু এক অব্যর্থ উপায়— তোমার প্রসন্নতা লাভের এক অমোঘ কারণ—সর্ব্বসন্তাপ-নাশিনী রজতময়ী মুদ্রা তোমার পূজায় বলি স্বরূপে সমর্পণ। যদি কেহ তোমার নিকটে উপযুক্ত রজতবলি উৎসর্গ করিতে পারে অথবা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ তোমার গৃহিণীর তৃপ্ত্যর্থে স্বুবর্ণ কঙ্কণরূপ কুসুমরাজি উপহার দিতে পারে, তুমি নিশ্চয়ই তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া চামুণ্ডারূপে বলি গ্রহণ করতঃ তাহার বাসনা সুসিদ্ধ কর। কাজেই তোমার পূজার অনুপযুক্ত দরিদ্র শিক্ষিত যুবক তোমার মায়াবীজ জপ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়। তোমার বেতন হজমীগুলি মাত্র। তুমি যেরূপ সংহারিণী মুদ্রা রচনা করিয়া জীবের স্বর্ণ রৌপ্যরূপ শোণিত পান করিতেছ তাহা আর লেখনী মুখে প্রকাশ করা যায় না। তুমি অদ্বিতীয় নহ সত্য। জগতে তোমার দ্বিতীয় তৃতীয় অনেক

আছে। আর কি বলিব? তোমার প্রসন্নতা ব্যতিরেকে আপিসের দ্বারে শত সহস্র করাঘাত করিলেও তাহা খুলিবে না। তুমি যথার্থ পোষ্ট্‌বর পাঠের উপযুক্ত। তুমি উদার,—আত্মীয়-স্বজনের নিকট; তুমি পরোপকারী—তোষামোদ-কারীগণের পক্ষে; তুমি বিদ্বান—জাবেদা রিপোর্ট রচনায়; তুমি কৃতী—অকৃতী স্বজনের চাকুরী প্রাপ্তি বিষয়ে; তুমি কবি—বর্ণনায় বিশেষতঃ উমেদারগণের দরখাস্ত লিষ্ট করিবার সময়; তোমার অপরিসীম ক্ষমতার বিষয় চিন্তা করিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। তুমি তোমার কৌশল-জালে হাকিমকে ক্রমশই আচ্ছন্ন করিয়া নিজের মতলব সিদ্ধ কর। তোমার মনিব তোমাপেক্ষা সহস্রগুণে বুদ্ধিমান ও কৃতী হইলেও তোমার মায়াজাল ভেদ করিয়া উঠিতে পারেন না। তোমার মায়ায় তিনি সর্ব্বদা মুগ্ধ। ধন্য তোমার কল-কৌশল, ধন্য তোমার বাক্‌-চাতুরী!





অষ্টম কাণ্ড।

—*ꣳ*—

"সাঁচ শাপ ন লাগই সাঁচে কাল ন খাই।
সাঁচে কো সাঁচা মিলে সাঁচে মাং হি সমাই॥"—কবির।

আজকাল শিক্ষা-বিভাগে আবার এক নূতন উপসর্গের আবির্ভাব দেখা যায়। টেক্‌ষ্টবুক কমিটীরূপ মনোরম উদ্যানে ঐ ভয়ানক উপসর্গের তাণ্ডব-নৃত্যের অভিনয় অবিরত চলিতেছে। বেজার হইও না—গালিও দিও না। মনে মনে ভাবিয়া দেখ দেখি এ কেমন রহস্য! যিনি গ্রন্থকর্ত্তারূপে বিচারপ্রার্থী তিনিই আবার মেম্বররূপে বিচার-কর্ত্তা। বম্ ভোলানাথ। এ উপসর্গ আরও ভয়াবহ। এই উগসর্গের প্রকোপে অনেকেই একেবারে নাস্তানাবুদ হইয়া পড়িয়াছেন।

গৌরাঙ্গপ্রসাদে তুমি শিক্ষাবিভাগের শীর্ষস্থানে আরোহণ করিয়াছ—তোমার পুরোহিতের প্রপৌত্র অর্দ্ধ-শিক্ষিত হইয়া অর্থের সাহায্যের জন্য তোমার দ্বারে উপস্থিত হইল, তুমি তাহাকে দারিদ্র-দুঃখবিনাশের অমোঘ অস্ত্র প্রদান করিলে। সেই অর্দ্ধ-শিক্ষিত যুবক এবাগান ওবাগান হইতে কয়েকটী ফুল লইয়া একটী তোড়া বান্ধিয়া তোমার নিকট উপস্থিত করিল। তুমি তাহাই সাদরে লইয়া—তোমারই মন্ত্র শিষ্য সমন্বিত "সিলেক্ট কমিটীর" হস্তে

সমর্পণ করিয়া একটু মৃদু হাসি হাঁসিয়া ফেলিলে; আর অল্প-দিনের মধ্যেই সেই বাসীফুলের তোড়াটা সকলে একবাক্যে মনোনীত করিয়া ফেলিল। তোমার আশ্রিতের কোষাগার ক্রমে তোমারই বুদ্ধিবলে পূর্ণ হইতে চলিল, কিন্তু যিনি বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া মস্তিষ্ক বিলোড়ন করতঃ একছড়া সুগন্ধ কুসুমের হার রচনা করিয়া দিলেন, সেই হার ছড়াটা আশ্রয়তরুর অভাবে একেবারে জন্মের মত ধূলিসাৎ হইয়া গেল। সেই মালা-নির্ম্মাতা ঋণ-ভারে ক্রমশঃ অবনত মস্তক হইয়া পড়িলেন। এই তো তোমার লীলা খেলা। তোমার মর্ম্ম কে বুঝিবে? যে সকল গ্রন্থকর্ত্তা তোমার প্রেসে পুস্তকাদি মুদ্রিত করেন, তাঁহার পুস্তক নিতান্ত অকর্ম্মণ্য অসার হইলেও তোমার কৃপায় উৎকৃষ্ট-তর গ্রন্থাবলীর শিরে পদাঘাত করিয়া কেমন অলক্ষ্য ভাবে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়, তাহা ভাবিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। তাই বলি ভাই গ্রন্থকর্ত্তা! যখন তোমার কোন মাতুল শিক্ষা বিভাগে নাই, তখন তুমি মাথামুণ্ড পাত করিয়া শরীরের রক্ত জল করিয়া মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিবার জন্য কেন লেখনী ধরিয়াছ? আগে মাতুল জুঠাও—তবে বই লিখিও। নচেৎ একেবারে ধনেপ্রাণে মারা যাইবে। কথা না শুনিয়া পুস্তক মুদ্রিত করিলে, কাগজওয়ালা ও প্রেসের ঋণে তোমাকে সিবিল জেলের কম্বল আশ্রয় করিতে হইবে। যদি একজনকে সহায়

করিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও তোমার ফুলের ডালি নিতান্ত নিকৃষ্ট হইলেও বহুমূল্যে বিক্রীত হইবে। তাই ভাই তোমাকে বলি, সহায় সম্পদ না ঘটাইয়া কখনই ঐরূপ কার্য্যে ব্রতী হইও না।

বম্ ভোলানাথ, এটাও কম নয়। তোমার লীলার কেবল ঐ স্থানেই পরিসমাপ্তি হয় নাই—শুন, আর কি বলি। তুমি স্কুলের পরিদর্শনের ছলে মফঃস্বলে থাকিয়া দুই মাসের ষোড়শোপচারে আহারের যথাবিধি সংগ্রহ করিয়া চলিয়া গেলে, আর এদিকে অল্প বেতন-ভোগী স্কুলমাষ্টারগণ নিজের পরিবার পোষণে অসমর্থ হইয়াও তোমার ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া হতভম্ব হইয়া গৃহিণীর নিকট লাঞ্ছিত হইতে লাগিল। বল দেখি তুমি কোন্ প্রাণে ঐ আহার হজম করিলে? স্কুল পরিদর্শন ওরফে বেঞ্চ পরিদর্শন সুসাধা করিয়া ভেটের উপযুক্ততানুসারে স্কুলের মন্তব্য তোমার লেখনী মুখে মুক্তাক্ষরে প্রকাশিত হইল। হরি বোল হরি—এ উপসর্গ কিরূপ ভয়াবহ, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, আগে জানিতাম আপিসাঞ্চলেই এই উপসর্গের প্রাদুর্ভাব ছিল, কিন্তু এখন দেখি এ উপসর্গ আরও ভীষণতর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শিক্ষা-বিভাগক্ষেত্রে দিন দিন প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। এখনও এই উপসর্গের চিকিৎসা হইতে পারে—এখনও মনোযোগ পড়িলে (অবশ্য তোমার আমার নয়) এ ব্যাধি সুদূরে পরাহত হইতে পারে।

উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর—কেবল শিক্ষা-বিভাগের নহে—সব বিভাগের—হাওলাত বলিয়া নিম্নপদস্থ কার্য্যকারকের নিকট হাতপাতা রোগও আজকাল একটী প্রধান উপসর্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হাওলাত শোধের পাঠ বাবুদের বড় পড়া নাই—তাই তাঁহাদের সহস্র ছিদ্রবিশিষ্ট ধুচনীর ন্যায় স্মৃতিশক্তি হইতে হাওলাতী ব্যাপার একেবারে বিস্মৃতির অতল গর্ভে পড়িয়া যায়। নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীও সাহস করিয়া চাহিতে পারেন না—বাবুরও এ জন্মে হাওলাত শোধ হয় না। পরজন্মে পঞ্জর পিঞ্জর হইতে মাংস কাটিয়া পরিশোধ করিতে হইবে কি না, কে জানে? এরূপ হাওলাতের সংখ্যা বড় কম নহে। অল্প বেতনভোগী নিম্ন-পদধারী কর্ম্মবীর মসি-যুদ্ধে নিতান্ত শ্রান্ত ও ক্লিষ্ট হইয়া মাসান্তে যে যৎকিঞ্চিৎ মাহিয়ানা পান—তাহার মধ্যে বড়বাবুর মনস্তুষ্টির নিমিত্ত চিরদিনের জন্য অপরিশোধিতব্য অবশ্য হাওলাত কিছু দিয়া ভাবিতে ভাবিতে সামান্য টাকা কয়টী লইয়া বাড়ীতে আসিলেন—আসিবার পূর্ব্বেই গৃহ-প্রাঙ্গণে—চাউল-ওয়ালা, কাপড়-ওয়ালা এবং অন্যান্য ওয়ালাগণ টাকার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আপিসের পোষাক না ছাড়িয়াই তাহাদের প্রাপ্য টাকার মধ্যে কিছু কিছু দিয়া যৎসামান্য টাকা হস্তে লইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং যাহা কিছু উদ্বর্ত্ত ছিল, তাহা গৃহিণীর হস্তে দিতে—গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন আর টাকা

কি হইল? তখন নগণ্যোপজীবি বিমর্ষ হইয়া জমাখরচ পেশ করিলেন এবং বড়বাবুর হাওলাতী টাকা কয়টার কথাও উল্লেখ করিতে ভুলিলেন না। গৃহিণী অগ্নিশর্ম্মা হইয়া সহস্র জিহ্বায় বলিয়া উঠিলেন আমাদের চলেনা—খোকার একখানিও কাপড় নাই—আমার বাহির হইবার দ্বিতীয় বস্ত্রখানাও নাই—খাওয়া-দাওয়ার এত কষ্ট আমাদের হাওলাত দিলে চলিবে কেন? হাওলাত দিলে আর ফেরত পাওয়া যায় না ইত্যাদি নানাপ্রকার আক্ষেপ-সূচক কথা দ্বারা স্বামীকে অভ্যর্থনা করিলেন। ছোট বড় সব ঘরেই এইরূপ উপসর্গ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। বড়বাবুরা বড় বড় মাহিয়ানা ও তারপর নানাপ্রকার পার্ব্বনী দ্বারা নিজের উদর পূর্ণ করিতেছেন। তাহার উপর আবার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের নিকট হাওলাত ধ্বনি করিয়া হাত-পাতা রোগের অভিনয় দেখাইতেছেন। ইহাতেও বড়-বাবুদিগের আশার তৃপ্তি হইতেছে না, বরং ধূমযোনিতে প্রক্ষিপ্ত হবির ন্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই বলি—এ উপসর্গটী ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে সমূলে উৎপাটিত করিতে পার। নূতন কোন পদে উপযুক্ত প্রার্থীর দাওয়া ও দাবী সামান্য শীতল পাটীর লোভে পদতলে অনায়াসে দলিত করিয়া অকর্ম্মণ্য অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে অধীনে নিযুক্ত করতঃ নিজের লোভের পরিচয় দিতেও বড়বাবুরা কুণ্ঠিত হন না।

নবম কাণ্ড।

—:*:○:*:—

"চোরকে ছোড়ে, সাধুকো বান্ধে, পথিককো লাগাওয়ে ফাঁসি।
ধন কলি তেরি তামাসা, দুখ লাগে আউর হাঁসি॥"—কবির।

পাঠক! এখন একবার বিচারালয়ের দিকে দৃষ্টিপাত কর। যে স্থানে অবিরাম বিচার বিক্রয় হইতেছে,—সেই দিকে চাহিয়া দেখ, উপসর্গ কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে তথায় বিরাজিত। আরদালী হইতে আরম্ভ করিয়া বিচারক পর্য্যন্ত এই উপসর্গের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তাহাদের অস্তিত্ব অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত স্থূল-ভাবে পরিলক্ষিত ও অনুমিত হয় না। যে বিচারালয়েই প্রবেশ করনা কেন, ন্যূনাতিরিক্তরূপে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইবে, উৎকোচের পূতি-গন্ধে বিচারালয় প্রায় শ্মশান-ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শতকরা একটী লোক ঐ ব্যাধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে কি না তাহা সন্দেহের কুক্ষিগত। উৎকোচের মহিমায় নথী হইতে কত দলীল অপসারিত ও কত দলীল প্রবিষ্ট হইতেছে তাহা লিখিতে লেখনী কম্পিতা ও শক্তিশূন্যা হইয়া পড়ে। তবু উৎকোচের উপর যেরূপ তীব্রদৃষ্টি কর্ত্তৃপক্ষের পতিত হওয়া বিধেয়, তাহা হইতেছে না। লোভই ইহার মূলীভূত কারণ। এই লোভই মানুষকে রাক্ষস করিয়া তোলে—এই লোভই

কত লোককে নরহত্যা, নরহরণ ও কুৎসিত জাল করিতে প্রবর্ত্তিত করে।

বিচারালয়ে প্রবেশ করিয়াই দেখিবে—একজন চাপকান গায়ে পাগড়ী মাথায় সাক্ষীর হাজিরাটী হস্তে লইয়া সাক্ষী দেখিয়া লওয়ার ব্যজে, পক্ষের নিকট হাত পাতিতেছে। যাহা কিছু হউক ঐ খর্পরে না পড়িলে উপস্থিত সাক্ষী অনুপস্থিত বলিয়া হাজিরা ফর্দ্দে লিখিত হইল। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্য্যন্ত। বহুব[redacted] কষ্টে পক্ষগণ সাক্ষী আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে—আদালতের চো'খের উপর সাক্ষীগণ হাসিতেছে—চলিতেছে—বসিতেছে—কথা কহিতেছে; কিন্তু আশ্চর্য্য ঠক্‌চাচার প্রপৌত্র আরদালী ছাহেবকে হাজিরা ফিস না দেওয়ায় সাক্ষীগণ কপিল-শাপে প্রনষ্ট সগর-সন্ততির ন্যায় একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গেল। জানিনা, কোন্ ইন্দ্রজালবলে সাক্ষীগণের অস্তিত্ব আদালতের নথি হইতে বিলুপ্ত হইল—কার অভিশাপে নেমি নৃপতি সহসা বিদেহ হইল।

বিচারপতি—যিনি চক্ষু থাকিতেই অন্ধ—যিনি সঞ্জয়ের সাহায্য ব্যতীত কিছুই দেখিতে পান না—নথির পরিষ্কৃত কাচময় দেহের মধ্য দিয়া দেখিলেন—সাক্ষী অনুপস্থিত, অতএব তিনি কলেজে পঠিত লজিকের বলে বলীয়ান হইয়া অভ্রান্তরূপে সাব্যস্ত করিলেন,—সাক্ষী আদালতে আইসে নাই। "কিমাশ্চর্য্য মতঃপরং।" পয়সা! তুমি না করিতে

পার এমন কিছুই নাই। হে তাম্রময়ী দেবতে! তুমি উপস্থিত ৩॥ হাত পরিমিত মাংসাস্থি বিনির্ম্মিত নরদেহকে মুহূর্ত্তের মধ্যে অস্তিত্ব শূন্য করিলে—আবার সেই মুহূর্ত্তেই কোন কোন পক্ষের সৌভাগ্যবশতঃ মহামায়া রজতময়ীর প্রভাবে অনুপস্থিত ও অপ্রত্যক্ষীভূত নরদেহকে প্রত্যক্ষীভূত করাইয়া দিলে। হে রজতরূপিনী মহামায়ে। তুমিই কমিশনরের লেখনীমুখে আসন লাভ করিয়া শস্যপূর্ণ শ্যামল প্রান্তরকে সৌধাবলী পরিপূর্ণ আবাসে পরিণত করিতে পার—সুশীতল কিলালপূর্ণ শুভ্র কাদম্বার বিহারস্থল জলাশয়কে অনায়াসে হলাঙ্কিতক্ষেত্রে পরিবর্ত্তিত করিতে পার।

হাকিম নূতন হইলে মহাবলী-বেঞ্চ-ক্লার্কের আনন্দের আর সীমা থাকে না—তাঁহার গৃহিণীর যেমন-তেমন—উপগৃহিণীর ষোড়শোপচারে পূজার পথ সম্যক্‌রূপে পরিষ্কৃত হইয়াছে ভাবিয়া তিনি আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকেন। ঘুষের পয়সা এজলাসেই হাকিমের চোখের উপর আমদানী হইতে থাকে। কোনদিন হঠাৎ পয়সা পড়িয়া গেলে—যদি সুপ্তোত্থিত হাকিম-পুঙ্গব পেস্কারের দিকে দৃষ্টিপাত করেন—অমনি মুহুরীবাবু বলিয়া উঠেন—"হ্যারে ম'লো—কোর্ট ফি লাগাইয়া আন, নগদ পয়সা দিয়া কি করিব?" ভায়ার প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ববলে হাকিমবাবু মেছমেরাইজড্ ও স্তম্ভিত হইয়া পেস্কারের মুখনিঃসৃত অমৃত সমান বচনাবলী পান করিতে থাকেন। সেরেস্তার আমলাদের

মধ্যেও উৎকোচের প্রবাহ নানারূপে প্রবাহিত হইতেছে। ক্ষুদ্র বেতনভোগী মসিযুদ্ধে বিশারদ—সমর-নিপুণ বীরের ভবনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই, তাহার উৎকোচ গ্রহণের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যিনি বহুপরিবারের একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি—যাঁহার আয়ের উপর বহু লোকের অন্ন সংস্থানের ভার, তিনি কিপ্রকারে মাসান্তে বিংশতি মুদ্রা উপার্জ্জন করতঃ অন্য কোনরূপ আয়ের পথ না থাকাসত্বেও বাড়ীটী অট্টালিকা দ্বারা সাজাইলেন? এই প্রহেলিকার মূলোদ্ধার করিতে যাইয়া আমরা যাহা দেখি—তাহা অতি ভীষণ ও ভয়াবহ।

পুলিশের বিহারক্ষেত্রে এই উৎকোচরূপ উপসর্গের প্রভাব অত্যধিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। যে নিঃস্ব অন্ন-বস্ত্রের অভাবহেতু ক্লিষ্ট—অদ্ধ-শিক্ষিত যুবক তৈলাভাব-নিবন্ধন স্বগৃহ পরিত্যাগে প্রতিবেশীর তৈলে প্রজ্বলিত বর্ত্তিকার একপার্শ্বে বসিয়া দৈনিক পাঠ অভ্যাস করিয়া লইয়াছে—সেই যুবকই যখন কমলার কৃপায় পুলিশবিভাগে প্রবেশাধিকার লাভ করতঃ চাপরাশ কোমরে বান্ধিল—তখনই তাহার অবস্থার ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিল। সামান্য বেতনভোগী পুলিশ-কর্ম্মচারীর চাল-চলন দেখিলে বোধহয় ইহার মত বড়লোক এদেশে অতি অল্পই আছে। অল্প-দিনের মধ্যেই সামান্য উটজ গৃহের স্থলে—অমল-ধবল সৌধাবলী মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান হইল।

বাসভবন প্রাচীরে বেষ্টিত হইল—নূতন নূতন জলাশয় খনিত হইতে আরম্ভ হইল—বিবিধ সুগন্ধ কুসুমরাশিপূর্ণ উদ্যানাবলী গৃহকে সাজাইতে লাগিল। যেন অদৃষ্টাকাশে কোন একটী সুগ্রহ হঠাৎ অমানিশার ঘোর অন্ধকার ভেদ করিয়া—পৌর্ণমাসীর কৌমুদীরাশি ছড়াইতে লাগিল। বল ভাই! কাহার প্রসাদে, কোন যোগবলে, এরণ্ড কল্পদ্রুমে পরিণত হইল—অমাবস্যা, পূর্ণিমায় পরিবর্ত্তিত হইল। একি আরব্যোপন্যাসের আলাউদ্দীনের অত্যাশ্চর্য্য দীপ-বর্ত্তিকার প্রসাদে অকস্মাৎ এইরূপ পট পরিবর্ত্তিত হইল! কত কত নিরপরাধী নির্দ্দোষ মানবকে উৎকোচ গ্রহণে নরহন্তা সাব্যস্থ করতঃ পুলিশের মহারথী চালান দিয়া ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইতে সাহায্য করিয়াছেন তাহার বর্ণনা করিতে এ ক্ষুদ্র লেখনী সম্পূর্ণ অক্ষম। পুলিশ তুমি ধন্য! ভাবিয়াছিলাম শিক্ষিত সম্প্রদায় তোমার পাদমূলে আশ্রয় লইলে তুমি কতকাংশে সংস্কৃত ও পরিশোধিত হইতে পার—কিন্তু হায়! সে আশা আমাদের একেবারেই সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। ঘুষের জন্য তুমি একই মায়ের সন্তানের জীবন লইতে কুন্ঠিত নহ। লক্ষ্মীর বরপুত্রগণের মধ্যে বিবাদ হইলে তোমার পওয়া বার। তুমি এক কলহেই রৌপ্যনির্ম্মিত তৈজসপাত্রের আমদানী ও কাংস-পাত্রের রপ্তানী করিতে পার—কোষাগার স্বর্ণ রৌপ্যে পূর্ণ করিতে পার। তোমার কথা আর কি বলিব, পাশার

একদানে তুমি লক্ষ্মীর বরপুত্রের মধ্যে গণ্য হইতে অনায়াসে পার। পুলিশ! বর্ত্তমান শতাব্দীতে তুমিই প্রত্যক্ষীভূত শনিগ্রহ। তুমি যাহার প্রতি বাম—তাহার সাড়েসাত বৎসরের অধিক ভোগ হয়।

নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীদের কথা দূরে থাক্—উচ্চশ্রেণীর ধর্ম্মাবতারদের অমৃতকাহিনী শ্রবণ কর। এমন বৎসর প্রায় যায় না—যাহাতে কোন না কোন হাকিম-পুঙ্গবের উৎকোচ গ্রহণ সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থিত না হয়—তদন্তের জন্য কমিশন না বসে। গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী ক্ষুদ্র পদাতিক বা আরদালীগণ হাকিমদের মাহিয়ানার চাকর বলিয়া আমাদের উপলব্ধি হয়। বাসায় দ্বিতীয় চাকর না রাখিয়া তাহাদের দ্বারাই চাকরের কার্য্য করাইয়া লয়েন। সামান্য ক্রুটা হইলে তাহাদের প্রাণ পর্য্যন্ত বাতাভিহত কদলীপত্রের ন্যায় কাঁপিয়া উঠে। প্রভুদিগের আবাসগৃহে রক্ষিত মূল্যবান সামগ্রী ও ঐশ্বর্য্য তস্করের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্যাদাগণের রীতিমত পাহারা দিতে হয়।

বম্ ভোলানাথ! একি বিচারালয় না মহাশ্মশান!!! ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্মশানকালী। নিত্য ভক্তগণ প্রদত্ত নৈবেদ্য দ্বারা ডাকিনী যোগিনী তৃপ্ত হইয়া থাকেন—কিন্তু বড় বড় পূজায় মেষ মহিষ ছাগ বলি হইলে ইনি স্বয়ং সংগোপনে রুধিরপানে পরিতৃপ্ত হয়েন।

ধর্ম্মাবতারগণের সাধারণ রোগ—যাহা আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করি, তাহারই দুই একটার কথা বলিয়া আমরা এ অধ্যায় সম্পূর্ণ করিতে চাহি। মোকদ্দমার আরজি বর্ণনা পাঠ করিয়া হাকিম শ্রীযুক্ত একদিকে কাত হইয়া পড়িলেন—আর অমনি মনে মনে স্থির করিলেন বাদীর বা বিবাদীর case (মোকদ্দমা) সত্য। এই premise অবলম্বন করিয়া সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিতে হাকিমবাবু লেখনী উত্তোলন করিলেন। যেস্থানে সাক্ষী তাঁহার মতের প্রতিকূলে উক্তি করে—সেই স্থানেই তিনি কলম উঠাইয়া বসেন এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সাক্ষীর উপর সওয়াল করিয়া—সাক্ষীকে নিজের পথে আনিয়া জবানবন্দী করিতে থাকেন। সাক্ষীর জবানবন্দীর ফটো উঠাইতে যাইয়া নিজের ফটো উঠাইয়া লয়েন। এমতাবস্থায় আর বিচার হইবে কি? যেভাবে আজকাল বিচার হইতেছে তাহাতে হাকিমবাবু শ্যামের ধন রামকে দিতে—রামের ধন শ্যামকে দিতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন। নিষ্পাপ নির্দ্দোষীকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করেন না। ফাইল পরিষ্কার করাই যেন ইহাঁদের একমাত্র ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। একথাও বাজারে রাষ্ট্র—যিনি ছাপ করিতে মজবুত, তাঁহারই নাম সদরে জাহির। তিনিই হাকিমগণের শিরোমণি—যাঁহার ফাইলে পুরাতন নথী আদৌ নাই। তাইতেই বলিতেছিলাম বিচার করা ও বিচার বিক্রয় করা

দুই স্বতন্ত্র কথা। আদালতে বিচার না হইয়া—বিচার বিক্রয় হইয়া থাকে। যে যত পুরাণ মাল সকালে সকালে রপ্তানী করিয়া নূতন মালের আমদানী করিতে পারিবেন তিনিই বর্ত্তমান সময়ে হাকিম-পুঙ্গব। তাঁহার প্রমোশনের দ্বার উন্মুক্ত।

বিচারকার্য্য সময়-সাপেক্ষ—একথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বিচার বিশেষ চিন্তার কার্য্য। সত্যাসত্য নির্ণয় করা নিমিষ মধ্যে হইতে পারে না। এমতাবস্থায় একধার থেকে কোপাইতে আরম্ভ করিলে বিচার হওয়া দূরে থাক—সুবিচারের হত্যাকাণ্ডই অভিনীত হয়। দুই একজন হাকিমে এও একটি উপসর্গ লক্ষিত হয় যে, উকিল মোক্তারগণ যে যে নজির দেখাইয়া থাকেন—হাকিমবাবু তাঁহার রায়ে সে সকল নজিরের আদৌ উল্লেখ না করিয়া Scylla ও cary C dice রূপ মহাসঙ্কটের পথ এড়াইয়া চলিয়া যান। আর কি বলিব—সুবিচারের রঙ্গভূমি হাইকোর্ট একটু ফাইল clearএর দিকে তাড়াহুড়া না করিলে—বোধ হয় কতকটা বিচারের আশা করা যাইতে পারে। নচেৎ যেভাবে বিচারাসনে বর্ত্তমান সময়ে কার্য্য চলিতেছে, তাহাতে আর কাহারও নিস্তার নাই, মানুষ ধনে-প্রাণে মারা যাইতেছে। সুবিচার করিব এইরূপ সংকল্প করিয়া কয়টা বিচারক বিচারাসনে বসিয়া হংসপুচ্ছ ধারণ করেন। কৈফিয়তের হাত এড়াইয়া

সকলেরই উন্নতি পথে চলিয়া যাইবার ব্যগ্রতায় massacre of justice (বিচার হত্যা) অহর্নিশি ঘটিতেছে।

একটী মোকদ্দমা দায়ের করিতে যে কি ব্যয় ও কষ্ট সহ্য করিতে হয় তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরে অনুভব করিতে সম্যক্ অপারগ। হাকিমবাবুরা বোধ হয় বিবেক পকেটে রাখিয়া রায় লিখিতে বসেন। তাঁহাদের জ্ঞানালোকে সত্য অসত্য ও অসত্য সত্য হইয়া দাঁড়ায়। [redacted] বলি—ভাই সকল! বিবাদ বিসম্বাদ ত্যাগ কর—প্রাণান্তেও আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ১৲ টাকা আদায়ের জন্য ১৬৲ টাকা খরচ করিও না। মাংসলোভী বিড়ালের নিকট মাংসের অংশ নির্ণয়ের জন্য যাইও না। তিন কোর্ট পর্য্যন্ত মামলা জিনিয়া বাড়ী আসিয়া রোকড় খুলিয়া হিসাব করিয়া দেখ, তোমার 'ধনস্থানে শনিগ্রহ তাণ্ডব নৃত্য করিয়া সমস্ত উড়াইয়া লইয়াছে। তুমি ধনে প্রাণে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছ।

বম্ ভোলানাথ! একি জয় না পরাজয় !!! তোমরাই বিচার কর। তাই বলিতেছিলাম, আদালতে এক্ষণ বিচার বিক্রয় হয়—বিচার হয় না। কোর্টফির ভারে মানুষ একেবারে নাস্তানাবুদ হইয়া যাইতেছে। তোমার সহোদর একছটাক জমি অন্যায়পূর্ব্বক গ্রহণ করিল বলিয়া তুমি তাহার প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করিতে উঁদ্যত হইলে, তাহার প্রাণবায়ুকে জড়দেহ হইতে নিষ্কাশিত করিবার জন্য

কত গুণ্ডা নিযুক্ত করিলে, তাহাতে অক্ষম হইয়া পরিশেষে দৌড়াদৌড়ি করিয়া আদালতের শরণ লইলে। কিন্তু হায়! মোকদ্দমা রুজু করিতে যে ব্যয় হইল, তাহাতে দাবীর চতুর্গুণ ভূমি তুমি অনায়াসে ক্রয় করিতে পারিতে। তবু তুমি তোমার শিক্ষার গুণে নিজের সহোদরকে ঐ একছটাক জমি ছাড়িয়া দিতে নারাজ। ধন্য আমাদের শিক্ষা! ধন্য আমাদের দীক্ষা!!! আমরা কোন ব্যক্তি-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতেছি না।—তবে যদি এই চিত্র তাঁহারই প্রতিকৃতি বলিয়া তিনি মনে করেন, তবে আমরা নাচার।

বিচার বিভ্রাটে সুজলা-সুফলা-শস্য-শামলা বসুন্ধরা গতাসুনিকরের বাহুপ্রকরে খচিত, নরদেহে পরিপূরিত ও শবনিবহের মুণ্ডাস্থি সমূহে সংকীর্ণতা প্রাপ্ত মহাশ্মশানে পরিণত হইতেছে। ইহা দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হয় না? হায় হায়!! কত কমলার ভবন দীর্ঘকালব্যাপী মোকদ্দমার ব্যয়ভারে কালের করাল রদে চর্ব্বিত ও বিনাশপুরে উপনীত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। সহোদরগণের মধ্যে সামান্য বিষয় লইয়া কলহানলের শিখা উদ্দীপিত হইয়া কত ভদ্রাসন ভস্মীভূত হইয়াছে—তাহা কে গণিতে পারে? আবার যাঁহারা—বিবাদবহ্নি নির্ব্বাপিত করিবার নিমিত্ত বিচারালয়রূপ শান্তি-কুম্ভের নিকট 'শান্তিং দেহি' বলিয়া উপস্থিত হয়েন, তাঁহারা শান্তির

বিনিময়ে দরিদ্রতাজনিত দারুণ অশান্তি খরিদ করিয়া স্বীয় স্বীয় প্রতিভা ও বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে দিতে নয়নজলে বক্ষ ভাসাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়েন এবং দুই দিন পরে মহাজনের ঋণজালে জড়িত হইয়া পৈত্রিক ভদ্রাসনে উত্তমর্ণের আসন দিয়া মহাপথের পথিক হইয়া পড়েন। ভাই! এইরূপ অবশ্যম্ভাবী দুর্গতির মূলে স্বার্থ রাক্ষসের বিকট হাসি—আর তাহার মহাশ্মশানোচিত তাণ্ডব নৃত্য অনুক্ষণ অভিনীত হইতেছে। প্রাণপ্রতিম সহোদরকে পাটওয়ারী বুদ্ধি কৌশলে আবৃত করিয়া এক ক্রান্তির চারিভাগের একভাগও ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহ বলিয়া স্পর্দ্ধা কর—মহামহিম আমিত্বকে বিশ্ব-সংসার উৎসর্গ করিয়াও তৃপ্তি পাও না—নিজকে কেন্দ্র করিয়া পুত্র-কলত্রাদি—নতু ভ্রাতা ভগিনী পিতামাতাদি—ব্যাসার্দ্ধ লইয়া সুখের বৃত্ত অঙ্কিত করিতে অবিরত চেষ্টা পাইতেছ—যাঁহাদের করুণাবলে তুমি এত বড় হইয়া উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছ—তাঁহাদের কোন কথা অসহ্য জ্ঞানে তোমার প্রাণপ্রতিমার ফুল্ল-নলিনীসম প্রফুল্ল বয়ান একটু শিশিরসিক্ত হইলেই তুমি একেবারে চণ্ডমুণ্ড বধের আয়োজন কর—মানবত্বকে দানবদলনী সর্ব্বসংহারিণীর পাদমূলে রোষ-অসি উত্তোলিত করিয়া সংহার কার্য্যে লিপ্ত হও—আর সর্ব্বশরীর রুধির প্রদিগ্ধ হইয়া রক্তজবার বর্ণে রঞ্জিত হয়, তাই এত বিচারালয়ে ছুটাছুটি—তাই এত অর্থনাশ—তাই এত মনস্তাপ! যদি

তুমি বক্ষঃস্থল বিস্তৃত করিয়া অর্জ্জুনের ন্যায় গাণ্ডীব ফেলিয়া বলিতে পারিতে—

"ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ নচ রাজ্যং সুখানি চ।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দকিং ভোগৈর্জ্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব॥
অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতাবয়ং।
যদ্রাজ্য সুখ লোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ॥"

যদি "সব্‌মে রসিয়া, সব্‌মে বসিয়া, সব্‌কা লিজিয়ে নাম,
হাঁজি হাঁজি কর্ত্তে রহিয়ে বৈঠে আপনা ঠাম॥"

যদি পরোপকাররূপ মহাযজ্ঞে স্বার্থরূপ মহিষ আহুতি দিতে পারিতে—যদি দানবদলবিমর্দ্দিনী মহিষমর্দ্দিনীর নিকট আমিত্বকে জ্ঞানকৃপাণে বলি দিতে পারিতে—তবে আর এই ভয়াবহ মহা অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিত না। সমস্ত সংসার শান্তির আলয় ও আনন্দের পারাবার হইত। তাই সাধুভক্ত কবির বলিয়াছেন ;—

"কবির সোই পীর হ্যায় যো জানে পর পীর,
যো পর পীর ন জানই সে কাফের বে পীর।"



দশম কাণ্ড।

—*৩০*—

"গোউয়া দোকে কুত্তা পালে ওস্‌কি বাছুরা ভুকা।
শালেকো উত্তম খিলাওয়ে বাপ্ না পাওয়ে স্বখ॥
ঘরকা বহুড়ি পিরীত না পাওয়ে চিত যোগাওয়ে দাসী।
ধন কলি তেরি তামাসা, দুখলাগে আউর হাসি॥"—কবির।

পূর্ব্বে যখন উপসর্গ শীর্ষক প্রস্তাবটী লিখিতে আরম্ভ করি, তখন আদৌ ভাবি নাই, আমাকে এতদূর অগ্রসর হইতে হইবে, এখন দেখি যতই হাঁটিতেছি, ততই পথ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। কবে যে গন্তব্য স্থলে উপনীত হইব, তাহা ভবিষ্যতের তমোময় কুক্ষিগত। এখন মনে হইতেছে ইহাকে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে পরিণত করিয়া সাধারণের হাস্যাস্পদ হইব ও মুদ্রা যন্ত্রের নিকট তমঃশুক প্রদানে লেখনীর কৃতিত্ব লাভ করিব।

মা! কুলকুণ্ডলিনি! একবার এ অধমের মূলাধারে জাগ্রত হও মা! আর কত নিদ্রা যাইবে? তুমিই তান্ত্রিকের মূলশক্তি—বৈষ্ণবের বৈষ্ণবী ও বিজ্ঞান জগতের তাড়িত শক্তি। তুমি ব্যতীত এই ধন-ধান্য-পূর্ণা স্বজলা-স্বফলা-শ্যামলা বসুন্ধরা মহাশ্মশান। আর আমরা সেই মহাশ্মশানের পরিদগ্ধ কীটানুকীট। তুমি জাগ্রত না হইলে—সাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত ও বিশুদ্ধ প্রদেশে

গমন করিয়া আজ্ঞাখ্যের সংকীর্ণ পথের মধ্য দিয়া সহস্রারে উপস্থিত না হইলে, আমার এই অবসন্ন হস্ত আর লেখনী সঞ্চালন করিতে পারে না। শ্বেতপদ্মাসনা ভারতি! তুমিও তোমার সহচরী কল্পনাসহ আমার নিকট উপস্থিত হও। তুমি দয়া না করিলে এই নীরস ও নগণ্য সামান্যাদপি সামান্যতর বিষয় কেমন করিয়া চিত্রিত করিব?

আমি জানি—আমার আসন বটতলার বসাক কোম্পানীর ক্ষুদ্র তমসাপূর্ণ কুটীরের একপ্রান্তে অথবা ঐ উপানৎ বিক্রেতার দোকানের এক কোণে স্থাপিত রহিয়াছে। ইহা জানিয়াও—সম্মুখে ভাবী জীবনের মানচিত্রখানি খুলিয়া দেখিয়াও যে লেখনী চালাইতেছি তাহাতেই পাঠকগণ পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন এ হৃদয় কিছুতেই ভীত হইবার নহে। লজ্জা—এ নির্লজ্জের নিকট হইতে লজ্জা পাইয়া যখন দূরে পলাইয়াছে, তখন আর আমার ভয় কি? যে সমালোচকের ভয়ে লেখকগণ সতত বিকম্পিত, সেই সমালোচকের সমালোচনা করিতে এ লেখনী নক্ষত্রবেগে ছুটিতে কখন বিরতিমূলে আশ্রয় গ্রহণ করে না। এই অয়স্ নির্ম্মিত তুলিকা দধীচির হাড় অপেক্ষাও কঠিন। যা'ক্ মুখবন্ধের আর প্রয়োজন নাই। চল পাঠক! একবার ঐ ধবল মার্ব্বেল প্রস্তর বিনির্ম্মিত সুরম্য হর্ম্ম্য মধ্যে প্রবেশ করি। আহা কি আশ্চর্য্য শোভা—কি মনোমুগ্ধকারিণী প্রতিমূর্ত্তিগুলি! সুন্দর আলোকমালায় সজ্জিত

এ হেন ভবনে বাবু তাকিয়া ঠেস্ দিয়া চিত্র বিচিত্র আল্‌-বোলায় ধূমপান করিতেছেন—স্বর্ণনির্ম্মিত মুখনল-যোগে ধূমরাশি মুখবিবরে প্রবেশ করিয়া স্থানাভাব হেতুই যেন নাসিকা ও মুখ হইতে বিনির্গত হইয়া বর্ত্তুলাকারে উপরে উত্থিত হইতেছে। ঐ দেখ—বাবুর সম্মুখে কয়টা ভদ্রলোক সেই ফরাসে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। পাঠক! মনোযোগ করিয়া কর্ণপাত কর—শুন, কি কথা চলিতেছে।

বাবু। কই সাক্ষী আনিয়াছেন?

ভদ্র। আনিয়াছি—ঐ সাক্ষীগণ আপনার সম্মুখে বারেন্দায় দাঁড়িয়ে আছে।

বাবু। আমার প্রস্তুতী প্রশ্নমালা কোথায়?

ভদ্র। এই লউন।

বাবু একে একে সকল সাক্ষীগণকে নিজে ঐ প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর লইলেন এবং যে যে স্থানে সাক্ষী উত্তর দিতে গোলযোগ করিল তাহা সংশোধন করিয়া দিয়া বিচারকের চ'খে ধুলিরাশি নিক্ষেপ করিবার অব্যর্থ আগ্নেয় অস্ত্র প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

ধন্য শিক্ষা, ধন্য দীক্ষা বাবুর। বিশ্ব বিদ্যালয়ের চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এখন বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিবার জন্য ওকালতীর রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে বসিয়াছেন। মোয়া-ক্কেলের উপকারের জন্য সাক্ষীগণকে প্রস্তুত করিয়া দিয়া

ঐ সঙ্গে সঙ্গে নিজের অক্ষুণ্ণ গৌরব স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। ধন্য উকীল বাবু! ধন্য আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধি! আপনি উকীলগণ মধ্যে সমধিক প্রতিষ্ঠা লাভের নিমিত্ত যে পন্থা অবলম্বন করিয়া ত্রিতল ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং কোষাগারে চঞ্চলা লক্ষ্মীকে অচঞ্চলা করিয়া রাখিতে প্রয়াস পাইতেছেন, সে পথ অতি ঘৃণিত ও নিন্দার্হ হইলেও আপনার আইনের চ'খে অতি প্রশংসনীয়। মোয়াক্কেলের উপদেশ রূপ ব্যাগের মধ্যে না আছে এমন কিছুই জগতে দৃষ্ট হয় না। কোন্ সাক্ষী দ্বারা কি বিষয় প্রমাণ হইবে, তাহা যখন আপনার অবশ্য জ্ঞাতব্য—যেহেতু উহা কর্ত্তব্য কর্ম্মের লিষ্ট্-ভুক্ত, তখন আর আপনার সাক্ষী শিখান কার্য্যটী কি প্রকারে অকর্ত্তব্য বলিব? আপনি অবশ্য পরের উপকারের জন্য যেরূপ নিষ্কামধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিতে বসিয়াছেন—এরূপ ধর্ম্ম যশোদা-নন্দনও কখন গীতার মুখে প্রচার করিতে পারেন নাই। আপনার পরামর্শবলেই এক রাত্রির মধ্যে অনেক দিনের পাকা পিলার স্রোতস্বতীর অতল গর্ভে স্থান লাভ করিতেছে। অনেক কুবের-কল্প লক্ষ্মীর বরপুত্র চিরদিনের জন্য দারিদ্র্য-রাহু-কবলিত ও পথের ভিখারী হইতেছে।

উকীল শব্দটা রত্নগর্ভা পারস্য ভাষারূপ অমূল্য খনি হইতে উৎপন্ন। তোমাতে এই শব্দের প্রত্যেক অক্ষরের মূলার্থ সম্যক্ বর্ত্তমান। তোমাকে ধন্যবাদ দিই—যেহেতু

তুমি পরের উপকারের জন্য ২৪ ঘণ্টা মাথা ঘুরাইতেছ—নিউটন্ বা গ্যালিলিওর ভাস্করাচার্য্য বা আর্য্যভট্টের ন্যায় চিন্তার গভীরতম গর্ভে ডুব দিয়া কত অমূল্য theory বাহির করিয়া পরের হিতসাধন ব্রতে লিপ্ত রহিয়াছ। পরের সম্পত্তি ও জীবন রক্ষার্থে রসনারূপ আগ্নেয় অস্ত্রে আইন ও নজিররূপ গুলি পুড়িয়া বিচারকাভিমুখে ফায়ার করিতেছ। উকীল! যদিও তুমি mercenary, ফি ব্যতীত কথা কহিতে নারাজ, তবু তোমার অনেক মহত্ত্ব আছে। তুমি মহান্ হইতেও মহানতর—যেহেতু তুমি বিচারককে অনেক সময় গোলোকধাঁধায় ফেলিয়া হাবুডুবু খাওয়াইতেছ। পঞ্চানন্দ তোমাকে organ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকিলেও আমি তোমাকে পরোপকারব্রতে দধীচি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আসন পাইবার উপযুক্ত মনে করি। কিন্তু ভাই উকীল! আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইও না। তোমাতেও অনেক উপসর্গ বর্ত্তমান দেখিতেছি।

তুমি স্বীয় পরিচ্ছদের অন্তরালে এত অসত্য পোষণ করিতেছ যে, তাহা ভাবিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। সত্য-রূপী নারায়ণ! তুমি সেই সত্যকে একেবারে বিসর্জ্জন দিতেছ। মোয়াক্কেলের নিকট বৃত্তান্ত শুনিয়া আবেদন-পত্রে বা বর্ণনায় যেরূপ বর্ণনা করিতেছ, তাহাতে তোমার ওকালতীর কার্দ্দানী বাহির হইতেছে বটে; কিন্তু তাহাতে সত্যের লেশমাত্রও নাই। সত্যশূন্য মানবজীবন আর

সূর্য্যশূন্য আকাশ উভয়ই সমান। কল্পনাপ্রসূত অভাব রাক্ষসের নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া কেবল অর্থপিপাসায় পরিতৃপ্তি সাধনোদ্দেশ্যে সত্যকে পদতলে দলিত করিতেছ। ভাই! সংসার কয়দিনের জন্য? জীবনের মূলমন্ত্র সত্যকে ফেলিয়া দিয়া কেবল অসার অর্থের ষোড়শোপচারে পূজা করিতেছ। মোয়াক্কেল জুটাইবার জন্য হোটেলে হোটেলে ঘুরিতেছ—নিজেকে তৃণাদপি লঘুতর করিয়া তুলিতেছ। তাই বলিতেছিলাম—সত্য বিনা মানবজীবন মরুভূমি সদৃশ। তোমার জিহ্বা সতত অসত্য কথা কথনে তৎপর—তাই তুমি আমার চ'খে নিতান্ত নিকৃষ্ট জন্তু হইতেও অধম। তুমি আজকাল পঞ্চ-মকারের প্রধান উপাসক—তোমাতে সবকয়টা পূর্ণাবয়বে বর্ত্তমান। অবিদ্যা ও সুরা তোমার সঙ্গিনী। তুমি শিক্ষিতসম্প্রদায়ের শীর্ষ-স্থানায় হইয়াও তুমি নরকের কীট। বর্ত্তমান সময়ে যদি শিক্ষিতসম্প্রদায় ঐ পথের পথিক হয়েন, তবে হে মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি দ্বিখণ্ড হও, আমরা তোমার গর্ভে প্রবেশ করি। মানবজীবন এত দুর্ল্লভ তাহা জানিয়া শুনিয়াও মনুষত্বের পরিবর্ত্তে পশুত্ব খরিদ করা কতদূর সঙ্গত—তাহা তুমিই বুঝিয়া লও। কুকি সাঁওতালেরা তোমা অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। একটী ভদ্রমহিলাকে রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া, একা তুমি নহে—অনেক শিক্ষিত যুবকই যেরূপভাবে দৃষ্টিপাত করে, তাহা স্মরণ

হইলে তোমাকে "নরমুণ্ডধারী ছাগ" উপাধি দেওয়া ব্যতীত কোন ইউনিভারসিটীই master of art উপাধি দিতে পারে না। একথাও শুনা যায়—তুমি উপযুক্ত ফি লইয়াও সময় সময় ইচ্ছাপূর্ব্বক মোয়াক্কেলের কার্য্যে উপস্থিত হও না,—একথা যদি সত্য হয়, তবে আমি জিজ্ঞাসা করি, তোমার শিক্ষায় কি ফল ফলিল? এই যদি শিক্ষা হয়—এইরূপ শিক্ষিত সন্তানই যদি বিশ্ববিদ্যালয় প্রসব করেন—তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব না থাকাই দেশের পক্ষে সহস্রগুণে কল্যাণকর। আর কিছু বলিতে চাহি না! স্বোপার্জ্জিত অর্থের কনিকামাত্র পিতা মাতার সেবায় ব্যয় করিতে তুমি অসম্মত, অথচ অবিদ্যার সেবায় অহর্নিশি অর্থাঞ্জলি প্রদান করিতে ভ্রুক্ষেপও করনা। তুমি বাস্তবিক কলির চেলা। পরনিন্দা তোমার ভূষণ—অবিদ্যার উপাসনা তোমার জীবনের ব্রত—যেন তেন প্রকারে অর্থোপার্জ্জন তোমার একমাত্র লক্ষ্য, অসত্য তোমার দীক্ষাগুরু।

কেবল উকীলের মধ্যে যে এইরূপ চিত্র আছে এমত নহে—অনেক ডাক্তার, আমলাও হাকিমশ্রেণীর মধ্যেও ঐ বিচিত্রিত চিত্র দৃষ্ট হয়।

ভাই এটর্ণি! তোমার ফাঁদ উকীলের ফাঁদ হইতে অতি প্রশস্ত ও ভয়াবহ। তোমার খর্পরে একবার যাহাকে পড়িতে হয় সে আর ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমার নিকটস্থ হইতে বাসনা করে না। তুমি তোমার আপিসরূপ মহাশ্মশানে

শাণিত অসি ধারণ করিয়া যেরূপভাবে তোমার কর্ত্তব্য-কর্ম্মের ব্যাগ খুলিয়া বস, তাহাতে তোমার নিকটস্থ হইতে জীবমাত্রেরই ভীষণ আশঙ্কা হয়। তোমার বিলরূপ আশীর্ব্বাদ যাহার শিরে একবার বর্ষিত হয়, সে আর প্রাণান্তেও তোমার সম্মুখীন হইতে ইচ্ছা করে না। তোমার অর্থোপার্জ্জনের ফাঁদ এতদূর প্রসারিত যে তোমার বধ্য তোমার মৈায়াকেল মোকদ্দমার তারিখটী তোমাকে স্মরণ করাইতে গেলেই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তোমার লেখনীপ্রসূত সুন্দর অক্ষরমালা-পরিহিত শ্বেত মার্ব্বল নিভ বিলখানি তাহার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক Iron safe হইতে পঞ্চ মুদ্রা টানিয়া আনিল। ভাই এটর্ণি! তুমি ত শুনি ইউনিভার-সিটীর চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ—ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত কৃতী ও যশস্বী—তবে তুমি কোন্ প্রাণে তোমার ভ্রাতৃবক্ষের শোণিত এইরূপ মানবাকারে দানবের ন্যায় পান করিতে বসিয়াছ? ভাল জিজ্ঞাসা করি—তোমার হৃদয় কি মানব হৃদয় উপা-দানে নির্ম্মিত নহে? তুমি কি পাষাণ অপেক্ষাও কঠিনতর? শ্মশানকালীর প্রতিমূর্ত্তিই কি সভ্যতার আলোকে আলো-কিত হইয়া নরকর কাঞ্চী পরিহার করতঃ চোগা চাপকানে সজ্জিত হইয়া শব-শিবা পরিপূরিত নরকঙ্কালে সমাবৃত শ্মশানক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া সুদৃশ্য-হর্ম্মে আশ্রয়লাভ করিয়াছেন? দিবানিশি আপিস রূপ বধ্যভূমিতে মোয়া-কেলরূপ ছাগমাংসে উদরপূর্ণ করিতেছ। বিষ্ণুশর্ম্মার

বৃদ্ধ ব্যাঘ্র যেমন চলৎশক্তি রহিত হইয়া পথিককে সুবর্ণ-কঙ্কণ দানের লোভ দেখাইয়া সাদরে আহ্বান করিয়াছিল এবং পথিককে সম্মুখীন হইতে দেখিয়া 'অহহ মহাপঙ্কে পতিতোঽহমি' বলিয়া তাহার নিকটস্থ হইতে উদ্যোগ করিয়াছিল—তোমরা কি অরিজিনাল ছাইডের বাদী ও বিবাদীকে পাইয়া সেইরূপ অভিনয় করিতেছ না? রাগিও না—বেজার হইও না—ভাবিয়া দেখ—একটু চিন্তা করিয়া দেখ—তোমরা কি ভাবে অর্থোপাৰ্জ্জন করিতেছ।

ভ্রাতৃদ্বয়ের হৃদয়াকাশের পশ্চিম কোণে একটু মনো-মালিন্যরূপ জলদাংশ দেখা দিল—তুমি তৎসংবাদ পবন-দেবের নিকট, শ্রবণ করিবামাত্র ভ্রাতৃদ্বয়-মধ্যে একটীর বৈঠকখানায় দেখা দিলে এবং অমনি তুমি বলিয়া উঠিলে, অহো! তুমি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছ। ভয় কি? বৃহন্নলা সারথি থাকিতে কিছুমাত্র চিন্তা করিও না, আমি তোমার পক্ষ সমর্থন করিয়া তোমার বিষাদের কালিমা বিনাশ করিয়া দিব। তোমার উৎসাহরূপ বাতাসে সামান্য ক্ষুদ্র মেঘ-খানি ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতৃদ্বয়ের হৃদয়গগন সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। পূর্ব্বে যে ভালবাসার নক্ষত্র-গুলি অন্তরাকাশে ধিক্ ধিক্ করিয়া জ্বলিতেছিল, তাহা সম্যক্‌রূপে ডুবিয়া গেল। উভয়ের মধ্যে সুন্দ-উপসুন্দের সমর আরম্ভ হইল—তুমি বাহবা দিতে লাগিলে, আদা-লতের রঙ্গমঞ্চে উভয়ের সংগ্রাম অভিনীত হইতে লাগিল।

এক পক্ষ জয়লাভ করিল, কিন্তু তোমার মহাবলী বিলের সম্মান রক্ষা করিতে যাইয়া আদালত বিজয়ী বীর সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারী হইল। তাই বলি—তোমরা শিক্ষিত ও সুসভ্য—তোমাদের ব্যবসায়ের সংস্কার সাধন করা বর্ত্তমান সময়ে অতি প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। তোমরা একটী প্রধান উপসর্গ। তোমাদের প্রসাদে অনেকে একেবারে যথাসর্ব্বস্বান্ত হইয়া দরিদ্রতা নিবন্ধন চিতাভস্মা-লেপ দিক্‌পটধর হইয়া উঠিতেছে। তাই বলিতেছিলাম, এক্ষণও সাবধান হও—এক্ষণও ভাইয়ের বিত্ত ভাই হইয়া ঐরূপে আত্মসাৎ করিও না।

ডাক্তার! তুমি রাবণের প্রপৌত্রই যেন নরাকারে ডাক্তাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তোমাদের অভিধান হইতে সামাজিকতা ও চক্ষুলজ্জা এই দুইটী শব্দ একেবারে পলায়ন করিয়াছে। রোগীর চিকিৎসার জন্য তোমাকে ডাকা হইল—রোগীর অন্তিমকাল উপস্থিত—প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর ফেলিয়া পলাইবার পথ খুঁজিতেছে—এমন সময় তুমি উপস্থিত হইয়া এক লম্বাচৌড়া presoription করিতে বসিলে—রোগী চিরনিদ্রায় চক্ষু এ জন্মের মত মুদ্রিত করিল তবু তুমি তোমার ভিজিটের জন্য মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশের নামে কজকোর্টে নালিশ রুজু করিতে বিরত হও না। নিজের সহধর্ম্মিণী তোমার শ্বশুরালয়ে যাইয়া পীড়িত হইলেন, তোমাকে সংবাদ দেওয়া হইল, তুমি যেন

চিকিৎসকরূপে শ্বশুর ভবনে কয়দিন চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আহারে রসনার তৃপ্তি সাধন করিয়া প্রণয়িণীর চিকিৎসা-কার্য্য শেষ করিলে; বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই নিজের সুসজ্জিত মুদ্রিত বিল শ্বশুরের নামে প্রেরণ করিলে; তোমার মত গুণধর জামাতার বিল পাইয়া শ্বশুর একেবারে হতভম্বা হইয়া পড়িলেন। এ কি ভয়ানক অর্থোপার্জ্জন স্পৃহা! কি ভীষণ লোভ!! কি অমানুষিকী ধনাগমের চিন্তা!!

ডাক্তার পাঠক মনে করিতেছেন, লেখক অতি রঞ্জিত করিয়া ডাক্তারের চিত্র আঁকিয়াছেন। লেখক এইমাত্র বলিতেছেন—এ নহে কাহিনী—এ নহে স্বপন—এ নহে কবির কল্পনা বা জল্পনা। আবশ্যকমতে নাম পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত।

ডাক্তারের prescription মরধামে পড়িয়া রহিল, যাহার জন্য prescription সে অমরধামে চলিয়া গেল। যাহারা তাহার ওয়ারিশ বর্ত্তমান রহিল, তাহারা সেই ডাক্তারের ঋণ পরিশোধ করিতে হাবুডুবু খাইয়া কোন প্রকারে কূল কিনারা পাইলেন। ভাই ডাক্তার! বেজার হইও না—অথবা মনে মনে অতি কদর্য্য ভাষায় লেখকের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করিও না। ভাবিয়া দেখ দেখি কথাটী প্রকৃত কি না? যে অর্থোপার্জ্জনের জন্য নৈসর্গিক চক্ষুকে অনৈসর্গিক চখে পরিণত করিয়াছ—যাহার জন্য দিবা

রাত্রি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতেছ—যে রজতময়ীর নিকট আত্মবলিদান দিয়া তাহার পূজার পরিসমাপ্তি করিতেছ—সেই অতি কৃচ্ছ্রলব্ধ ধন গগন হইতে উচ্চতর জনকের সেবায় ব্যয়িত না হইয়া—সংসারের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সহোদরের কিম্বা তাহার চৌদ্দপুরুষের মধ্যে কাহারও সেবায় জলদের শ্রাবণসুলভ জলবর্ষণের ন্যায় ব্যয়িত হইতেছে। তাহাতে তোমার কিঞ্চিন্মাত্র কষ্ট হইতেছে না। তুমিও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি ব্যাধিগ্রস্ত। তুমি নিজে চিকিৎসক হইয়া নিজের ব্যাধির চিকিৎসা করিতে পারিতেছ না—পরের পীড়া বিনাশের জন্য দিবারাত্রি খাটিতেছ।

সন্ধ্যার পর তোমার ডিস্‌পেন্‌সরীতে বোতল-বাহিনীর যেরূপ পূজার আয়োজন দৃষ্ট হয়—অবিদ্যার যেরূপ নৃত্য গীত আরম্ভ হয়—তাহা মনে করিলে তোমার ঔষধালয়টীর স্থান সোনাগাছি বা মেছুয়াবাজারে হওয়াই উচিত। আর তুমি মনুজাকারে দনুজ নামে অভিহিত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ব্যক্তিগত উপসর্গের মূলোচ্ছেদ করিতে পারিলে সমাজের উপসর্গ আপনি অন্তর্হিত হয়। তুমি আমি লইয়া যখন সমাজ গঠিত হয়, তখন তুমি আমি পবিত্র হইলে সমাজও পবিত্র হইয়া উঠে। আর অধিক বলিতে চাই না—প্রত্যেক ব্যক্তিতে উপসর্গের লীলাখেলা দেখিতে পাই।

শিক্ষকের উপসর্গ, স্কুলে ছেলে পড়াইবার সময় বন্ধুর নিকট চিঠি লেখা—আর যত প্রকার চাবি বাহির হয়, তাহা

দ্বারাই জ্ঞানের দ্বার খুলিবার নিমিত্ত শিষ্যদিগকে আদেশ করা। কখন বা টেবিলের উপর শ্রীচরণদ্বয় লম্বিত করিয়া বেতসাসনে মস্তক সন্নিবেশিত করত পদ্মনাভ স্মরণ করিতে থাকা। ছেলের চরিত্র যতই কেন কুৎসিত হউক না শিক্ষক মহাশয়ের তদ্বিষয়ে ভ্রুক্ষেপও নাই।

অল্প আয়ের লোকের ভাগ্যে ভূষণপ্রিয়া ভার্য্যার হস্তে পতিত হওয়াও কম উপসর্গের কথা নহে। সমস্ত দিন জীবন-আহবে সংগ্রাম করিয়া যাহা লাভ হইল, তাহা দ্বারা পুত্র পৌত্রের উদরান্নেরই সংকুলন করা ঈশ্বর ইচ্ছা, এইরূপাবস্থায় অর্দ্ধাঙ্গী ধনী প্রতিবেশিনীর হীরক-সুবর্ণময় অলঙ্কারের ঝন্‌ঝনিতে—রজতময় আড়খেমটা মলের ঠুন্‌ঠুনিতে ঝালাপালা হইয়া স্বামীর নিকট মনের সাধ কথঞ্চিৎ মিটাইবার নিমিত্ত যাহা চাহেন, তাহাও দুর্ভাগ্যের আয়োজন করা দুঃসাধ্য। তাই বলিতেছিলাম—সংসারে এরূপ উপসর্গও অনেক আছে। সংসার যেরূপ ক্রমশঃই অশান্তির আলয়—দুঃখের বিহার-উদ্যান হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে প্রাণোপম তনয় ভক্তিভাজন পিতার ও পরমারাধ্যা জননীর উপসর্গ, প্রাণপ্রতিম স্বামী ভার্য্যার উপসর্গ, ভৃত্য প্রভুর উপসর্গ, সহোদর সহোদরের উপসর্গ। বম্ ভোলানাথ! এমন উপসর্গময় সংসারে এখন বাস করা অতীব কঠিন।



একাদশ কাণ্ড।

—*:○:*—

"ক্যা হিন্দু ক্যা মুসলমান ক্যাইসাই জৈন।
গুরু ভক্তি পূরণ বিনা কোই না পাওয়ে চৈন।"—কবির।

আমি কেমন পাগল, আর কোন বিষয় খুঁজিয়া পাই না, আস্তাকুঁড়ে প্রক্ষিপ্ত সামান্য নগণ্য বিষয়টী অবলম্বন করিয়া মিসরের 'পিরামিড' রচনা করিতে বসিয়াছি। নিজ ব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়া পাঠকবৃন্দকেও উত্তপ্ত করিতে বসিয়াছি। মন! তোমাকে এখনও বলি, তুমি এ পথ পরিত্যাগ কর, নচেৎ সকলে তোমার প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিবে। বিদ্রূপ ও শ্লেষের কশাঘাতে তোমাকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। তবু আমার কেমন ক্ষেপা মন, প্রবোধ বাক্য মানে না—হিতকথায় কর্ণপাত করে না! দৈনিক কার্য্যের গুরুভারে প্রপীড়িত হইয়াও বৈঠকখানায় আসিলেই সংগোপনে ডাকিয়া উপস্থিত বিষয়ের যথাযথ লিখিতে বলে। তাই আবার লেখনী ধারণ করিলাম।

আজ, ধর্ম্ম-জগতে উপসর্গের লীলাখেলা কিভাবে চলিতেছে, তাহার দুই-এক কথা না বলিয়া অন্য দিকে যাওয়ার ইচ্ছা নাই, তাই আজ প্রথমেই ধর্ম্ম-ক্ষেত্র হইতেই উপসর্গের একটী চিত্র পাঠকগণের সম্মুখে ধরিলাম। এই চিত্র ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া অঙ্কিত হয় নাই। যদি

কেহ এই চিত্রকে নিজ মুখেরই প্রতিকৃতি বলিয়া আমাদিগকে গালাগালি দেন, আমরা নাচার !!!

ঐ যে গৈরিক আলখেল্লা পরা, রুদ্রাক্ষের মালা-বিভূষিত পরম যোগী পুরুষটী ঐ বৃক্ষতল আলোকিত করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, আর মধ্যে মধ্যে "আলেক্ ! আলেক্ !" ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া ঘোর তান্ত্রিক ও ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, চল পাঠক ! একবার উঁহার নিকটে যাই। ঐ দেখ মহাপুরুষের কপালে কেমন সুন্দর সিন্দুরের ফোঁটা, হস্তে মহাশঙ্খের মালা, সম্মুখে একটী নরকপাল মহাপাত্র নামে তান্ত্রিক জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া টলটলায়মান-সুরাদেবীকে উদরে ধারণপূর্ব্বক "মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমেবচ। মকারং পঞ্চমং কৃত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥" এই শ্লোকের বিশদ ব্যাখ্যা করিতেছে। পরিধানে একখানি গৈরিক বসন। গলদেশ হইতে প্রলম্বিত রুদ্রাক্ষের মালা ভুজঙ্গাকারে বক্ষঃস্থলকে বেষ্টন করিয়া শায়িত রহিয়াছে। নবীন যোগীকে দেখিবার জন্য কত আধুনিক শিক্ষিত ভদ্র-মণ্ডলী মিলিত হইয়াছেন; তাঁহার ভক্ত শিষ্য হইবার জন্য দলে দলে ছুটিতেছেন। আর এই সময় আমরা কি এই সুবিধা—এই মাহেন্দ্রক্ষণ—পদতলে দলিত করিয়া যবনিকার অন্তরালে অবস্থান করিব—এই মূল্যবান্ জীবন পশুত্বে পরিণত করিব ? চল পাঠক ! আমরাও ঐ তাপস প্রবরের

সন্নিকটে গমন করিয়া কৃতার্থ হই। আর অদ্য মহাশক্তি জগন্মাতা করাল-কাল-ভয়-বারিণীর পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে করিতে জিহ্বাকে পবিত্র করি।

যোগী প্রাণায়ামে রত—নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপমিব; স্থির—পলকশূন্য—শান্তিরসের উৎস—সাত্ত্বিক ভাবের অবলম্বন। ব্রহ্মানন্দ পরমহংস ভূতলে অজিন আস্তরণ বিস্তৃত করিয়া তদুপরি বদ্ধ পদ্মাসনে উপবিষ্ট। দেখিলেই হৃদয়ে ভক্তিরসের উদ্রেক হয়; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ভক্তগণের হৃদয়-বিহারী সেই মহাপুরুষ—ভৈরবী না হইলে পঞ্চমকার সাধনা হয় না—তান্ত্রিক ক্রিয়া সম্যক্ স্ফুরণ হয় না বলিয়া একটী চণ্ডালিনীকে তন্ত্রানুসারে ভৈরবী বানাইয়া দিগম্বরী করতঃ নিজ-অঙ্ক-শায়িনী করিতে প্রস্তুত। এ সকল অতি গুহ্য কথা। তন্ত্রের মহিমা কে বুঝিবে? নিজের বিবাহিতা সহধর্ম্মিণী মহাপুরুষের ভৈরবী না হইয়া—নীচকুল-সম্ভবা অন্যের পরিণীতা-কামিনী, মহাপুরুষের অঙ্কশায়িনী হইল। "প্রবৃত্তে ভৈরবী চক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ দ্বিজোত্তমাঃ।" এই মহা শ্লোকের প্রসাদে বর্ণভেদ ঐ সময়ের জন্য তান্ত্রিক জগৎ হইতে অস্তিত্ব হারাইয়াছে। ধন্য মহাপুরুষ! তুমি হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক। তুমি বর্ণভেদ উঠাইয়া দিবার বিষয়, কেবল বাক্যদ্বারা নহে, ক্রিয়া দ্বারা সকলকে শিক্ষা দিতেছ। এ শিক্ষার জন্য হিন্দু সমাজ ও হিন্দুধর্ম্ম তোমার নিকট সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম্মানুসারে পরিণীতা

স্ত্রীকে কোন্ দোষে বর্জ্জন করিয়া—চণ্ডালিনীকে দিগম্বরী ভৈরবী সাজাইয়া, আর নিজে দিগম্বর ভৈরব হইয়া ভক্ত ও এই শিষ্যগণের নিকট ভৈরবীচক্রের অভিনয় করিতেছ? এই কার্য্য যদি সাধনমার্গের উপযোগী বলিয়া মনে কর, তবে কেন নিজের সহধর্ম্মিণীকে ঐ উৎকৃষ্ট পথে না আনিয়া অপরের চক্ষুদান করিতেছ? অথবা সাধকদিগের "বসুধৈব কুটুম্বকং।" স্বীকার করি, তন্ত্র অতি জটিল, তৎপ্রণোদিত ক্রিয়া ও সাধনপ্রণালী অতীব কঠিন। যখন তোমার কামানলে এখনও চরমাহুতি প্রদত্ত হয় নাই—এই ক্ষণও তোমার সন্তানাদি উৎপন্ন হইতেছে—এখনও তুমি ঊর্দ্ধ-রেতঃ হও নাই—এখনও তোমার হৃদয়ে কাম ক্রোধ ও লোভাদি ষড়রিপু ভয়াল হিংস্রজন্তুর ন্যায় বর্ত্তমান, তখন কেন তুমি অন্যের স্ত্রীকে কুলের বাহির করিয়া আনিলে?

তোমার ভক্তবৃন্দ শিষ্যানুশিষ্য তোমার মতানুযায়ী হইলে, বিবাহ প্রথা বোধ হয় সমাজ হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় লইবে। ব্রহ্মানন্দ "অস্মাচাস্ত" বলিয়া চীৎকার কর—অথবা 'মা' 'মা' শব্দে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ কর—তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর; একটা কথা বলি—ধর্ম্মের পরিচ্ছদ পরিয়া তন্ত্রের দোহাই দিয়া প্রাচীনকালের কাল-ভুজঙ্গিণী উপদেবীর ন্যায় মধুর বীণাবাদনে লোকমণ্ডলীকে আকর্ষণ করিয়া তাহাদের পরকাল আর নষ্ট করিও না—তুমি উচ্ছিন্ন হও—আপত্তি নাই; কিন্তু তোমার পথ

অনুসরণ করিয়া ঐ দেখ তোমার শিষ্যগণ মধুকরের ন্যায় শুঁড়ীর দোকানে প্রবেশ করতঃ বোতল-বাহিনীকে উদরস্থ করিয়া ভৈরবী অন্বেষণে "সোণাগাছি" কিম্বা "মাথাঘসার" গলিতে টলিতে টলিতে চলিয়া যাইতেছে। ক্ষণকাল পরেই ঐ দেখ নর্দ্দমায় পড়িয়া প্রক্ষিপ্ত ভুক্তাবশিষ্ট-সেবী মার্জ্জারকে উৎকৃষ্ট পানীয় আধার বলিয়া স্বীয় সাময়িক শক্তির পূর্ণ বিকাশ করতঃ ধারণপূর্ব্বক ঐ শুন বলিতেছে "সকল সময় তুমি কর ঢক্‌ঢক্, আমার সময় তুমি ছাড় মেও ডাক"। আর বলিতে চাই না—লিখিয়া লিখিয়া কাগজের শ্রাদ্ধ করিতে চাই না। দৃষ্টান্ত অন্বেষণের জন্য যত্ন করিতেও চাই না। বর্ত্তমান সময়ে এই এক উপসর্গ সমাজের ভীষণ ব্যাধির মধ্যে দেখা দিয়াছে।

তুমি বিদ্যাবলে নিউটনের প্রিন্সিপিয়ার মধ্যে অনায়াসে প্রবেশলাভ করিতে পার—ভারতীর লেখনী নিঃসৃত কবিতার গুরুত্বের মধ্যে সহজে প্রবেশ করিতে পার—ভক্তিবলে ধ্রুব ও প্রহ্লাদের তপোজনিত সাত্বিকতার অগাধ সাগরে ডুবিতে পার, কিন্তু এই নরপুঙ্গবদের মধ্যে প্রবেশ করা অতি কঠিন। পাঠক! সাইরেনের কথা কি স্মৃতিপথে উদিত হয়? ইহারা তদপেক্ষাও ভয়ানক। মুখবন্ধে গীতার দুই একটি শ্লোক আওড়াইতে আওড়াইতে তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক মা'র নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ইহারা শিকার অন্বেষণে ইতঃস্তত বহির্গত

হয়। তুমি ইউনিভার্‌সিটীর ডিক্রী পাইয়া উকীল বা হাকিম হইয়াছ, তোমাকে মায়াজালে আবদ্ধ করিতে পারিলেই—মন্ত্র-শিষ্য করিতে পারিলেই—ভৈরবীর অভাব-পক্ষে গৃহিণীর "অনন্ত" প্রস্তুতের জন্য আর ভাবিতে হইবে না বিবেচনায়, নানাপ্রকার ভণ্ডামির চূড়ান্ত দেখাইয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে চেষ্টা করে। তাই বলি এই উপসর্গ গুলির হাত হইতে নিষ্কৃতি না পাইতে পারিলে আর রক্ষা নাই—ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট হইবে। ভাই! তুলসী দাসের কথা কি ভুলিয়া গিয়াছ? ঐ শুন প্রাণের তুলসী বজ্র-গম্ভীর-নিনাদে বলিতেছেন—

"সদ্‌গুরু পাওয়ে, ভেদ বাতাওয়ে, জ্ঞান করে উপদেশ।
তব্ কয়লা কি ময়লা ছোটে, যব্ আগ্ করে পরবেশ॥"

আর ঐ শুন, ধর্ম্মবীর কবির কি বলিতেছেন—

"কবির গুরু পারশ গুরু পারশ, হায় গুরু চন্দন সুবাস
সদ্‌গুরু পারশ জিউকে, ফিনহো দিনহো মুক্তি নেওয়াস্
"কবির গুরু পারশমে ভেদ হ্যায়, বড় অন্তর যান্।
যোহোঁ লৌহ কাঞ্চন করে, যে এ করি লেই আপু সমান॥"

এই কি তোমার সেই সদ্‌গুরু—যিনি চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, চতুর্ব্বিধ খাদ্যে সপ্তাহ কি দ্বিসপ্তাহ কাল জনার্দ্দন স্মরণ করিতে করিতে তোমার আলয়ে অতিবাহিত করিয়া, স্বগৃহে যাইবার সময়, তোমার অতীব প্রয়োজনীয় দ্রব্যটী অনায়াসে চাহিয়া লইয়া গেলেন। ঐ কি তোমার

সদ্‌গুরু—যিনি ভ্রমক্রমেও একদিন তোমাকে আধ্যাত্মিক ভাবের একটী কথাও বুঝাইয়া দিলেন না, অথচ বাজারদর অনুসারে গুরু-প্রণামীর হারটী কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিবার জন্য নিজ সংসারের বহুবিধ অভাবের কথা তোমার নিকট পাড়িয়া তোমাকে একেবারে ঝালাপালা করিয়া তুলিলেন। এই কি তোমার সেই গুরু—যাঁহাকে কবির স্পর্শমণি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সদ্‌গুরুই জীবের স্পর্শমণি, যেহেতু তিনি জীবের মুক্তি-নিবাস। স্পর্শমণি লোহাকে কেবল কাঞ্চন করে, কিন্তু সদ্‌গুরু শিষ্যকে আপন সমান করিয়া তুলিয়া থাকেন। সুতরাং স্পর্শমণি ও সদ্‌গুরুতে অনেক প্রভেদ। তাই বলি এই শ্রেণীর গুরুকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই শ্রেণীর গুরুর সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া আমরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছি। আর আমাদের আশা নাই—ভরসা প্রদীপ নির্ব্বাপিত। এই মহাশ্মশানে আমরা কি কেবল দগ্ধ হইবার জন্যই আসিয়াছি? পতঙ্গ কি কেবল অগ্নিতে পুড়িবার জন্যই জন্মিয়াছে? সাধু তুলসীদাস! সত্যই বলিয়াছ—

"রাম রাম সবকোই কহে, ঠক ঠাকুর ক্যা চোর।
বিনা প্রেমসে রিঝত নহি তুলসী নন্দকিশোর।"



দ্বাদশ কাণ্ড।

—*০*—

'ব্রাহ্মণ ভয়া, তো ক্যা ভয়াগলে পেটে সুত।
জ্ঞাও ভক্তিকা মরম না জানে যাই সে জঙ্গলা ভূত॥ —কবির।

মন। তুমি একটু স্থির হও, এই পিঞ্জরে কিঞ্চিৎ সময় কালদণ্ডের উপর শান্ত ভাবে অপেক্ষা কর। আমি একবার মায়ের পূজা করিতে বসি; তাম্রবিনির্ম্মিত কোষা মধ্যে নির্ম্মল সলিল রক্ষা করিয়া তাহা পূতবারি গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি তীর্থ স্বরূপা পবিত্র স্রোতস্বতী নিচয়কে আহ্বান পূর্ব্বক পবিত্রীকৃত করতঃ আচমন করিতে আয়োজন করি; মন তুমি একটু অপেক্ষা কর। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের সুমিষ্ট কণ্ঠধ্বনিতে এক সময়ে হিমাদ্রি হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমপদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্" যে মহাগীতি প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল সেই বাক্য উচ্চারণ করিয়া আচমন করিতে বসি। ওঁ বিষ্ণু!!! যা—মন। তুই কোথায় চলিলি, বিষ্ণু স্মরণ করিতে বলিলাম, তুই একেবারে বিষ্ণুমন্দির এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের নৈসর্গিক শোভা পরিত্যাগ করিয়া কমলার বরপুত্রের ভবনে গরম গরম খাস্তা লুচির বা পলান্নের পাতে বসিয়া গেলি। হায়! হায়! আচমনেই এই গণ্ডগোল—করন্যাস, অঙ্গন্যাস ও ভূতশুদ্ধি কেমন করিয়া করি? রে মন! তোরে

পুনঃ পুনঃ বলিতেছি কিঞ্চিৎকাল চঞ্চলতা পরিহার পুরঃসর অপেক্ষা কর, তাহাতে তুই আদৌ কর্ণপাত না করিয়া মিঠাই মণ্ডাপূর্ণ হালইকরের দোকানে প্রবেশ করতঃ উদর পূজার অনুষ্ঠানে লিপ্ত হইলি ? কেমন করিয়া পূজা করি ? এই পূজার পূজক কে ? মন ! তোকে স্থির করিবার নিমিত্ত শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর প্রভৃতির শব্দ হইতেছে, সম্মুখে সৃষ্টির সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার কুসুমরাশি একত্রে একপাত্রে চন্দনচর্চ্চিত হইয়া সুসজ্জিত রহিয়াছে—নাটমন্দিরে কত ঢাকঢোলের কর্ণভেদী শব্দ হইতেছে—তবু তুই এসব পরিত্যাগ করিয়া এক দৌড়ে বাতাধিক গতিতে পূজার মন্দির হইতে পলাইয়া—একবারে দূরস্থ দোকানে সজ্জিত রসবড়ার রসের মধ্যে ডুবে গেলি ! তুই যদি পূজা করিতে না বসিস্, তবে যে সব বৃথা আয়োজন হইল। এই মাংসাস্থি শোণিতময় দেহের পক্ষে পূজা অসম্ভব। বম্ ভোলানাথ ! মায়ের পূজার এই প্রথম উপসর্গ উপস্থিত। যাঁহারা প্রতিনিধি দ্বারা মায়ের পূজা সম্পন্ন করিতে চাহেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব ? মা শক্তিস্বরূপিনী মহামায়ে ! তোমার পূজা আমার করা হইল না। কে কার পূজা করে ? মন ! তুমি রসনা তৃপ্ত করিবার নিমিত্ত যে রসের কাঙ্গাল হইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছ—বড়লোকের গৃহে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত সুনিপুণ সূপকার কর্ত্তৃক প্রস্তুতীকৃত চব্য চোষ্য খাদ্য ভোজনার্থে

দ্বারবান কর্ত্তৃক কতশত অর্দ্ধচন্দ্র জলযোগ করিতেছ, সে সব ত্যাগ করিয়া আমার বিশ্ববিমোহিনী মহাযোগিনী জ্ঞানরূপিনী সত্যসনাতনীর পদতলে একবার বসিয়া কেবল মা মা বলিয়া ক্ষণকাল ডাকিয়া দেখ, নিশ্চয়ই তৃপ্ত হইবে। শাঁক ঘণ্টার তুমুল রব কর। মনকে বান্ধিয়া আনিয়াছি। মায়ের পূজা করিতে বসিলাম। তুমি ঢাকি, তুমি ঢুলী বাদ্যকর; যেন মন আর পলাইতে ফাঁক না পায়।

মাতঃ দশভূজে! তোমার আবার প্রাণপ্রতিষ্ঠা কি করিয়া করিব? এই অল্প প্রাণ কি মহাপ্রাণের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে উপযুক্ত? যিনি জগদ্ব্যাপিকা বিশ্বরূপিনী—যিনি পর্ব্বতে পর্ব্বতে, লতায় লতায়, নদ নদীতে, ফুল ফলে, জল-স্থলে, অন্তরীক্ষে সকল সময় সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত—তাহার সত্ত্বা কোথায় নাই? কোথায় তাঁহার অস্তিত্ব নাই যে তাঁহাকে আবাহন করিব? যিনি সকলের প্রাণ তাঁহার আবার প্রাণপ্রতিষ্ঠা। যিনি সর্ব্বসময় জীয়ন্ত—তাঁহার আবার প্রাণপ্রতিষ্ঠা? এমন স্থান নাই, যে স্থানে আমার মায়ের ক্ষণকালের জন্যও অভাব। জড় স্থূল সূক্ষ্ম ও সৌরজগতে সর্ব্বত্র সর্ব্ব সময় মা আমার বিদ্যমানা—জীবন্ত মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিতা। তাঁহার আবার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা!! যিনি সকলের তেজস্বরূপ—তাঁহার আবার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রেও যে মা আমার বিরাজমানা—এই সম্মুখস্থ মূর্ত্তিতেও আমার সেই মা সমুপস্থিতা। মন!

এই বেলা নিজের কাজ করিয়া লও। সংসার ভুলিয়া—স্ত্রীপুত্র ছাড়িয়া একবার আমার মা'র নিকট আত্মনিবেদন কর। স্ত্রীপুত্র ভাই বন্ধু কেবল বান্ধিবার জন্য। তাই বলি—এই সময় একবার মা'র চরণকমলের রসে লোলুপ মধুকরের ন্যায় ডুবিয়া যাও।

মনই আমার প্রধান উপসর্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—এই উপসর্গের প্রভাবে আমি একেবারে শব হইয়া পড়িয়াছি। আমার অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে—আমি আর আমার নাই। বম্ ভোলানাথ! মনের কুটিলগতিতে আমি কোথায় যে ভাসিয়া যাইতেছি তাহার প্রতি আমার লক্ষ্যই নাই। আহারে, শয়নে, ভ্রমণে সকল সময়ই মন শৃঙ্খলরহিত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় কোথায় যে চলিয়া যায় তাহা আমি ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারি না। জ্ঞানাঙ্কুশে কতবার আঘাত করিতেছি, কিন্তু মন-মাতঙ্গ তাহা মানিতেছে না।

প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিয়া জগজ্জননীর নাম করিতে বসি—পূজার সমস্ত উপকরণ সম্মুখে বর্ত্তমান রাখিয়া আসনে বসিবামাত্র—মন আমাকে কুবের-কল্প ধনীর ধনাগারে ফেলিয়া দিয়া কত যে হাবুডুবু খাওয়ায়—তাহা এ ক্ষুদ্র লেখনী মুখে প্রকাশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সেই কোষাগারের বিভব-সমুদ্রের অতলগর্ভে ডুবিয়া যাইয়া পূজা সন্ধ্যা সমস্ত ভুলিয়া যাই। মহামায়ার পূজা হওয়া

দূরের কথা—নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হারাই। অনেকক্ষণ পরে যদি কোনমতে মনকে বান্ধিয়া আনি, তবে গায়ত্রী জপ করিতে না করিতে—কুটিল মন আবার পথবাহিনী সুন্দরী কামিনীর অঞ্চল ধরিয়া তাহার সঙ্গে কোথায় চলিয়া যায়—তাহার আর খোঁজ খবর পাই না। এই ভাবে আমার সন্ধ্যা-বন্দনা, গায়ত্রী-জপকার্য্য শেষ হয়। এক লহমার তরেও মনকে আয়ত্ত করিতে পারি না—সে যে কোথায় কোথায় ফেরে—কার আস্তাকুড়ে ও খানায় পড়িয়া থাকে—তাহার আমি কোনই সন্ধান পাই না। তাই বলি—মনই আমার প্রধান উপসর্গ।

কত জনের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি, মহাশয়! আমার হারান মনটী কি দেখিয়াছেন—কোন তত্ত্ব বলিয়া দিতে পারেন? সকলেই বিদ্রূপ হাসি হাসিয়া—আমাকে পাগল মনে করিয়া চলিয়া যান, কিন্তু এটী স্বপ্নেও ভাবেন না—আমার মত পাগলই সংসার পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে।

মন্ত্রদাতা গুরুদেবের নিকট সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলাম, গুরুদেব! আমার এই ভয়ানক ব্যাধির কি কিছু চিকিৎসা করিতে পারেন—আমার এই পাগল মনটাকে কি সুস্থির করিয়া দিতে পারেন? গুরুদেব বলিলেন, যোগ করিতে থাক—পূজা করিতে থাক—ভ্রূর মধ্যে দৃষ্টি-শক্তি আবদ্ধ করিয়া জপ তপ করিতে থাক—ব্যাধি আরোগ্য হইবে। কিন্তু আমার পীড়া তাহাতে

আরোগ্য হইতেছে না, উচ্ছৃঙ্খল মন আমাকে কখন হিমাদ্রির শিখর হইতে বঙ্গোপসাগরের গভীর গর্ভে ফেলিয়া দিতেছে—কখন বা ত্রিতলবাসিনী নীরদবাসিনীর সুকোমল উৎসঙ্গে শায়িত করিতেছে—কখন বা নৃসিংহ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সামাজিক হিরণ্যকশিপুকে সমাজের কূটনীতিজালে আবৃত করিয়া সংহার করিতেছে—কখন বা দম্ভের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাজিত করতঃ তাহার সিংহাসনে অধিরোহণ করিতেছে—কুখন বা পৌর্ণমাসীর সুধাময়ী যামিনীতে মলয়-মারুত-হিল্লোলে হিল্লোলিত সৌরভপূরিত সুন্দর কুসুমরাজির সন্নিকটে অলক্ষ্যভাবে দাঁড়াইয়া তাহার সৌরভে প্রমোদিত হইতেছে—কখন বা রন্ধনশালার ভিতরে প্রবেশ করিয়া সুদক্ষ সূপকার-প্রস্তুত উষ্ণ পলান্নের পাত্রের সম্মুখে বসিয়া পড়িতেছে—কখন বা নদীগর্ভে প্রবাহিত লক্ষ্যশূন্য পোতের ন্যায় ইতস্ততঃ চলিতেছে। হায় আমি উপায় কি করি? অসংযত মন আমার ছুটাছুটী করিতেছে; তাহাতে আবার সার্দ্ধ-ত্রিহস্ত পরিমিত এই দেহ-শকটখানিতে ছয়টা দুষ্ট অশ্ব সংযোজিত করিয়া অহর্নিশি চালাইয়া বেড়াইতেছে। ইহাদের যন্ত্রনায় আমি একেবারে দিবানিশি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পড়িতেছি—ক্ষণকাল বিশ্রাম নাই—অবিরামগতিতে এই দেহ-রথকে চালাইয়া—মন আমাকে একেবারে নাস্তানাবুদ ও

damaged করিয়া ফেলিয়াছে। অশ্ব কয়টীও এমনি অশিক্ষিত ও গাড়ি বহিতে অপারগ, যে কেহ কাহারও সঙ্গে মিশ খায় না—যার যার পথে সেই সেই যাইতে চায়। তাহাদিগকে সংযত করা কার সাধ্য? কতদিন যোগমায়ার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মায়ের নিকট শক্তি ভিক্ষা করিলাম—বল চাহিলাম—কিন্তু ভাগ্যদোষে ভব-জননী এ দাসকে কিছুই দিলেন না। তাই বলিতে-ছিলাম—মনই আমার প্রধান উপসর্গ। পাঠক ও পাঠিকার মধ্যে যদি কেহ এই উপসর্গনাশের চিকিৎসক থাক—আগুয়ান হইয়া মুষ্টিযোগ বা ব্যবস্থাপত্র দিয়া এ দুর্দ্দশাগ্রস্থ ভব ঘুরেকে কথঞ্চিৎ সুস্থ কর—মন খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব—তুমি যেন প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে অভিমত কিঙ্কর করে উপাদেয় "চা" লাভ করিয়া পরিতুষ্ট হও।

এই পঞ্চভূতাত্মক দেহ-গৃহের দুইটা অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নিয়ত বাত্যান্দোলিত শিব-শিরস্থিত জাহ্নবীর ন্যায় তর্জ্জন ও গর্জ্জন করিয়া আমাকে একেবারে ঝালাপালা করিতেছে। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি নাম্নী ভার্য্যাদ্বয় গৃহের মধ্যে দিবারাত্রি কলহ করিতেছে আর তাহাদের বিবাদ বিসম্বাদের প্রভাবে ২৪ ঘণ্টা দেহ-গৃহে আগুন জ্বলিতেছে। উভয়ের মধ্যে প্রবৃত্তি অতি মুখরা—প্রাতঃকাল হইতে রজনী পর্য্যন্ত তাহারই শব্দে ইন্দ্রিয় বাসভবন আমার এই জীর্ণ দেহ-গৃহ

মুখরিত হইতেছে। দুইটীই এক বিধাতারই কন্যা—অথচ তিলেকের জন্যও একের সহিত অন্যের সদ্ভাব নাই। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মধ্যে যে বাড়বাগ্নি সদৃশ দ্বেষানল অবিরাম মহাগর্জ্জনে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, তাহা নিভাইতে পারি এমন সাধ্য আমার নাই। সেই বহ্নিতে আমি নিয়ত দগ্ধ হইতেছি, আর কাতরস্বরে বিশ্ব জননীর অভয় চরণ-প্রান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া কৃপাভিক্ষা চাহিতেছি—মা! তুমি আমার এই ভয়ঙ্কর উপসর্গের মূলোৎপাটন করিয়া শান্তিবারি বর্ষণ কর—তুমি কৃপা-কটাক্ষে না চাহিলে এ অধম দাসানুদাসের পঞ্জরখানি ভাঙ্গিয়া গেল—জীয়ন্তেই মারা গেলাম।

দুই সতীনের ঘর করা আর শাণিত অসির ধারের উপর বিচরণ করা উভয়ই সমান। মাতঃ ভৈরবি! এ রাম রাবণের যুদ্ধ কতকাল সহ্য করিব—ঐ ভীষণ সমর-শোণিতে কতকাল ভাসিয়া যাইব।

কে বলে মা! রাম রাবণের যুদ্ধ ত্রেতায় হইয়াছিল—আমি দেখিতেছি—ঐ যুদ্ধ প্রতিদিন প্রতি মূহুর্ত্তে আমার এই সার্দ্ধ-ত্রিহস্ত পরিমিত দেহ-লঙ্কায় চলিতেছে। মনই আমার এই দেহ-লঙ্কার রাবণ; অপ্রতিহত প্রভাবে শরীর-রাজ্য অবিরত শাসন করিতেছে। দুরাশা নাম্নী মন্দোদরী মনরাবণকে নিয়ত চালাইতেছে। প্রবৃত্তি-ভগ্নি-শূর্পণখা-মুখে ভক্তি-সীতার অলৌকিক রূপরাশির প্রশংসা শুনিয়া

দেহ-লঙ্কার অধিপতি জটাজুট ধারণ করতঃ ভক্তি সীতাকে অপহরণ করিলেন। আত্মারাম এই কথা জানিতে পারিয়া বিশ্বাসরূপী পবননন্দন প্রভৃতির সহায়তায় কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রস্তরে অজ্ঞান জলধি বাঁধিয়া দেহ-লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন। এদিকে বিবেক বিভীষণের বাক্যে দেহ-রাজের আস্থা না থাকায় তাহাকে পদাঘাতে লঙ্কা হইতে তাড়াইয়া দিয়া নিদ্রিত ভ্রাতা-দম্ভ-কুম্ভকর্ণকে প্রবুদ্ধ করতঃ তুমুল সমর আরম্ভ করিলেন। কামাদিরূপ পুত্র নিচয় রাজ আজ্ঞায় ভীষণ যুদ্ধ করিতে উপস্থিত। বীরগণের পদভরে দেহ-লঙ্কা রসাতলে যাইবার উপক্রম, তাই মা শরণ্যে! ত্রাহিমে ত্রাহিমে বলিয়া দুস্তর জলধিজলে পড়িয়া চীৎকার করিতেছি। একবার এই পাপিষ্ঠের প্রতি দয়া করিয়া এই রাম-রাবণ সমরের নিবৃত্তি কর। আর সহ্য হয় না। বিবেকের রাজত্ব সংস্থাপিত কর। মা কল্যাণদায়িনি! কুচিন্তা ও অশান্তিকে সংহার করিয়া শান্তি রাজ্য বিস্তৃত করতঃ রাজ রাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে এই পাপিষ্ঠের হৃদয়াসনে আসীন হও। তোমার চরণাম্বুজের শীতল ছায়ায় এই বিদগ্ধ পামর সুশীতল হউক। আর মহাশ্মশান জ্বালিয়া এই নগণ্যকে জীয়ন্তে দগ্ধ করিও না। সন্তানের উপর মায়ের কোপ কতক্ষণ থাকিতে পারে? আর সংসার-সাগরে ফেলিয়া হাবুডুবু খাওয়া'ও না।

ভাই নিরাকারবাদি! ঠাট্টা করিও না—উপহাস করিও না। আমরা মূর্ত্তি পূজা করিতে বসি নাই। তুমি যাঁহার পূজা কর, আমিও তাঁহার পূজা করিতে বসিয়াছি। পারি, না পারি—সে উভয়ের পক্ষে সমান। যে চিণ্ময়ীশক্তিতে জগৎসংসার অনুপ্রাণিত—যে মহাশক্তিতে জীবজন্তু সমস্ত শক্তিমান—যে ব্রহ্মসাগরে সমস্ত প্রকৃতি নিমজ্জিত—সেই শক্তিকেই—সেই সাগরকেই আবাহন করিয়া সম্মুখস্থ মূর্ত্তিতে আনিলাম। ভাই নিরাকারবাদি! তাহাতে দোষ কি? মন! একবার আমার বিশ্বব্যাপিনী মায়ের ধ্যানে ব'স। জগৎজোড়া মা আমার রমণীয় মূর্ত্তিতে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মানা।

"ওঁ জটাজূটসমাযুক্তাং অর্দ্ধেন্দু কৃতশেখরাম্।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দু সদৃশাননাং॥"

ওঁ এই শব্দে অ, উ, ম, তিনই বিদ্যমান। আমার মায়ে তিন শক্তিই বর্ত্তমান, তাই তাঁহার ধ্যানে ওঁ দিয়া আমার ন্যায় অভক্ত পাষণ্ডকে আর্য্য ঋষিগণ স্থূলভাবে স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইতেছেন। মহাকাল মায়ের স্বরূপ বর্ণনা করিবার সময় তাই তারস্বরে বলিয়াছেন;—

"প্রসূতে সংসারং জননি জগতীং পালয়তিচ,
সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয় সময়ে সংহরতিচ।
অতস্বং ধাতাপি ত্রিভুবন পতিঃ শ্রীপতিরহো,
মহেশোহপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমী ভবতীম্॥"

অ=সৃষ্টি-শক্তি ব্রহ্মা; উ=পালন-শক্তি বিষ্ণু; ম=সংহার-শক্তি মহেশ্বর। অতএব মা আমার সংসার প্রসবিত্রী, সংসার পালয়িত্রী ও সংসার সংহারকর্ত্রী। বম্ ভোলানাথ! মায়ে ত্রিশক্তি সম্পূর্ণ বর্ত্তমান। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিবার—পালন করিবার—ও বিনাশ করিবার শক্তি—এই ত্রিশক্তিসমন্বিতা মা আমার মহাশক্তিরূপে সম্মুখে উপস্থিতা। তাই—"সর্ব্বশক্তি স্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোহস্তুতে" বলিয়া প্রণাম করি। নিরাকারবাদী শিক্ষিত ভ্রাতৃগণ! শুন উপনিষদ কি বলিতেছে ;—

"যতো ভূতানি জায়ন্তে যেন জীবন্তি সর্ব্বতঃ।
যস্মিংশ্চ বিলয়ং যান্তি নমস্তুভ্যো পরাত্মনে॥"

বম্ ভোলানাথ! দুইই এক হইয়া গেল। তবে উভয়ের মধ্যে গোল কোথায়? মাই আমার পরমাত্মা। নিরাকারবাদীগণ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া আমাকে মূর্ত্তি-পূজক বলিয়া উপহাস করিও না। ভাবিয়া দেখিলে উভয়েই তুল্য। তবে তুমি সূক্ষ্মধ্যান ধারণা করিতে পার, আমি হস্তি মূর্খ, তাই স্থূলভাবে না দেখিলে কিছু বুঝি না বলিয়াই আমাকে ঐরূপভাবে পূজা করিতে হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—শক্তি কি কখন তুমি প্রত্যক্ষ করিয়াছ? যদি করিয়া থাক, তবে তোমায় প্রশ্ন করি—শক্তির বর্ণ কি? আকার কি?

মা আমার জটাজূট সমাযুক্ত। মা আমার মহাযোগিনী তাই তাঁহাকে জটাজূট সমন্বিত বলিয়া ধ্যান করি। প্রকৃতির ভালে অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পাইলেই জগৎ হাসিতে থাকে—জ্যোৎস্নায় ভাসিতে থাকে। মা আমার বিশ্ব-জোড়া—আলোক ভরা—এই জন্য মায়ের তিনটী চক্ষু—সূর্য্য, অগ্নি ও চন্দ্র এই তিনটী চক্ষু লইয়া মা আমার ভুবনমোহিনীরূপে ভুবন আলোকিত করিয়া ভক্তের হৃদয়ে পৌর্ণমাসী রজনী প্রস্ফুটিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। পামর মন! এইবেলা একবার মাকে চোখ্ ভ'রে মনখুলে দেখে লও। আকাশে চন্দ্র সূর্য্য উদিত হইলে, ও পৃথিবীতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে যেমন অন্ধকার আর তিষ্ঠিতে পারে না, সেইরূপ যে ভক্তের হৃদয়ে মা আমার ত্রিনেত্রবিশিষ্টা হইয়া একবার উদিতা হন, তাহার হৃদয়ে আর অন্ধকার থাকিতে পারেনা। মা আমার বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন—এই জন্য চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি তাঁহার নেত্র। অজ্ঞানতারূপ ঘোর অন্ধকার মায়ের সমাগমে বিনাশ-প্রাপ্ত হয়। সূর্য্যদেব একবার উদয়াচলে উদিত হইলে যেমন সমস্ত অন্ধকার দূরিত হয়, মা যার হৃদয়ে সতত আবির্ভূতা—অজ্ঞানতারূপ গভীর তমোরাশি তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে। মা আমার দশবাহু সমন্বিতা—দশদিক জুড়িয়া রহিয়াছেন এবং দশদিকই রক্ষা করিতেছেন। মা এক এক হস্তে একএকটী ভীষণ আয়ুধ

ধারণ করিয়া মহিষ মর্দ্দন করিতেছেন। পাপ-মহিষ বধের নিমিত্ত মায়ের দশহস্তে দশবিধ অস্ত্র-ধারণ। এই পামরের হৃদয়ে কাম ক্রোধাদি রূপ ছাগ মহিষাদি সতত জাগ্রত-ভাবে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। মা তাই দেখিয়া মা ভয়ি মা ভয়ি রবে ঐ মহিষরূপ দানব দলনে লিপ্ত হইয়াছেন। মানুষ! তুমি হিংস্রজন্তু অপেক্ষাও ভয়ানক। হিংস্র-জন্তু লোকালয়ে থাকেনা—বন জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করে। তুমি তাহার ভয়ে বন জঙ্গলে যাইতে অস্বীকার কর। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—ভাই ছদ্মবেশী মানুষ! তোমার হৃদয়ের মধ্যে প্রতি মূহুর্ত্তে যে কাম কত কি ক্রিয়া করি-তেছে, তাহা কি তুমি সংখ্যা করিয়া বলিতে পার? কাম তোমাকে একেবারে নাস্তানাবুদ করিয়া ফেলিতেছে। তুমি কামের শরজালে বিদ্ধ হইয়া কত গর্হিত কার্য্য করিতেছ—ক্রোধের বশীভূত হইয়া নরত্ব কর্ম্মনাশার অতল-গর্ভে বিসর্জ্জন দিতেছ। তুমি দানব কি মানব একবার মনে মনে বিচার করিয়া দেখ দেখি। সেই দানব-দলন করিবার নিমিত্ত মায়ের জ্ঞানরূপ মহাসিংহের পৃষ্ঠে নানাবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া সমরাঙ্গনে আগমন। মা আমার পাপরূপ মহিষাসুরকে বধের নিমিত্ত—মানবের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিরূপ দানবকে বিনাশের জন্য বিবেক বৈরাগ্য ও বীর্য্যরূপী ত্রিশূল দক্ষিণকরে ধারণপূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে সমুপস্থিতা। দৈত্য-নিসূদিনী মা আমার এইরূপে

ভক্তের হৃদয়-মণ্ডপে বিরাজিত হইয়া সর্ব্বকাম ফলপ্রদা হয়েন; কিন্তু পূজা হইল এই—আর আমরা পূজা করি কার? পুরোহিত ঠাকুর বরণ হইলেন—যথা জ্ঞান কার্য্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। পূজার জিনিষ পত্র দেখিয়া পুরোহিত ঠাকুরের মন উঠিল না। ঠাকুর সেই চিন্তাতেই বিভোর!!! আজকাল আমাদের পূজা এক-প্রকার পেশাদারী গোছের হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিনিধি দ্বারা মায়ের পূজা আমার চোখে নিতান্ত দোষাবহ বলিয়া বোধ হয়। প্রতিনিধির ভক্তি আছে কিনা, মা-ই জানেন, কেবল মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিয়া কার্য্য করিতেছেন। ধ্যান—ধ্যেয় জিনিষ—পুরোহিত ঠাকুর বড় বড় করিয়া সেই ধ্যান উচ্চারণ করিয়া যজমানের মনস্তুষ্টি করিতেছেন। তাহাতেই বলি—পূজা কার—কে করে? ধর্ম্মক্ষেত্রে এ এক উপসর্গ।

যজমানের ভক্তিও আজকাল যেরূপ, মায়ের পূজাও সেইরূপ সম্পন্ন হইতেছে। একটী ভক্তের পূজার কথা বিবৃত করিতেছি—শ্রবণ করুন। কোন ভক্ত জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে নিজ গৃহে কতকগুলি ভদ্রলোকের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত মহাত্মারা বেলা ১০টার সময় ভক্তের বাড়ীতে যথারীতি উপস্থিত হইবেন এবং তাহাদের আহারাদি মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে ষোড়শোপচারে সম্পাদন করিতে হইবে, এই অভিপ্রায়ে মায়ের নিকট ত্রিসন্ধ্যার তিনটী

ছাগ একেবারে প্রাতঃকালীয় পূজার সময় মন্ত্রপূতঃ করিয়া যথারীতি বলি দেওয়া হইল এবং ছাগমাংস দ্বারা নিমন্ত্রিত বাবুদের উদরানলের যথাবিহিত আহুতি দেওয়া হইল। মা'র মধ্যাহ্নকালীয় পূজার সময়—নাগ-যজ্ঞোপবীতিনী সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়া চতুর্ভুজার তুষ্টির নিমিত্ত কেবলমাত্র ইক্ষুদণ্ড বলি স্বরূপে প্রদত্ত হইল। বাস্তবিক মা যখন প্রাতঃকালেই অর্থাৎ break fastএ তিনটী ছাগ গ্রহণ করিয়াছেন, তখন ভক্ত তাহা চিন্তা করিয়াই dinnerএর সময় কেবলমাত্র tiffin স্বরূপ সামান্য ইক্ষু দ্বারা তাঁহার মাধ্যাহ্নিক পূজার পরিসমাপ্তি করিলেন এবং সায়ংকালে কেবলমাত্র কুষ্মাণ্ড বলি দিয়া মহাশক্তি শাক্তাচারপ্রিয়া আধারভূতা জগদ্ধাত্রীর সেবার পূর্ণতা সম্পাদন করিলেন। বলিহারি যাই! ভক্ত! তোমার আত্মবৎ সেবায় মা'র যেরূপ পূজা সম্পাদন করিলে, এরূপ সেবাই কলিতে প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। তুমি প্রাতঃকালে মায়ের পূজার জন্য একটু "চা" প্রস্তুত করিয়া দিলে আরো ভাল হইত। তাই বলিতেছিলাম—পূজা কার? ইহা উদরের পূজা, না মায়ের পূজা তাহা অতি সমস্যার কথা। লোক জন খাওয়ান অতি মহান্ কার্য্য সন্দেহ নাই, কিন্তু মাকে ঐরূপে ফাঁকি দেওয়া নিতান্ত পামরের কার্য্য। একে মানব-মন অতি চঞ্চল—একস্থানে তিলমাত্র সময়ও অপেক্ষা করে না, তাহাতে আবার এইরূপ ব্যবস্থা,

ইহা দেখিয়া যথার্থই মায়ের পূজা হয় কি না, আপনারা ভাবিয়া দেখুন।

শারদীয় উৎসব সময়ে কত গৃহে ছাগ মেষ মহিষাদি শাস্ত্র-প্রণীত মতানুসারে মন্ত্রপুত হইয়া বলি স্বরূপে প্রদত্ত হয়, কিন্তু কয়টী গৃহে মেষরূপ লোভ, ক্রোধরূপ মহিষ ও কামরূপ ছাগ বলি হইয়া থাকে বলুন দেখি। কয়টি ভক্ত মায়ের নিকট বসিয়া আত্মনিবেদন করিতে সক্ষম হয়েন। শত্রুবলি দেওয়ার রীতি অনেক স্থানেই আছে। গৃহস্বামী নিজ হস্তে ঐ শত্রু বলি দিয়া থাকেন, কিন্তু কয়টী গৃহস্থ নিজের শত্রু কামাদি রিপুনিচয়কে মহিষমর্দ্দিনী মায়ের নিকট উৎসর্গ করিয়া বলি দিয়া থাকেন। সন্ধিপূজায় ১০৮টী প্রদীপ অনেক গৃহে প্রজ্বলিত হয়, কিন্তু কয়টী গৃহে ভক্তিযোগে কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়। তাই বলি ভাই! যদি মায়ের পূজা করিতে চাহ, তবে কর্ম্মবীর হও। আত্মার বল আকর্ষণ কর। নিজের পশুত্বকে মায়ের নিকট যথাবিহিত উৎসর্গ করিয়া বলি দাও—পুঁথির শুষ্ক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ক্রিয়ার সমাপ্তি করিও না। হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখ। তিন দিন তিন রাত্রি মায়ের নিকট কেবল নিজের অসারত্ব জ্ঞাপন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর। ভক্তি ও বিশ্বাসের আলো জ্বালিয়া হৃদয়মণ্ডপ আলোকিত করিয়া রাখ, আর চিন্তা কর মা তোমার হৃদয়ে আসীন হন কি

না? মা আমার মহাশক্তি-স্বরূপিনী, মায়ের নিকট শক্তি প্রার্থনা কর। বল চাও—যে বলে বলীয়ান্ হইয়া তুমি কামাদি রিপুগণকে সম্মুখসমরে নির্জ্জিত করিতে পার। মা আমার সর্ব্বমঙ্গলা—তিনি সর্ব্বমঙ্গলের—শিবের নিদান— মা আমার সর্ব্বার্থ-সাধিকে,—মায়ের সাধনা করিতে পারিলে চতুর্ব্বর্গ ফল নিশ্চয় ফলিবে। পূজা করিতে পারি না তাই দুঃখ,—তাই ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। যে ভক্ত সাধু প্রাণ মন খুলিয়া কেবল মা মা মন্ত্রে আকাশ পাতাল কম্পিত করিয়া জগদম্বাকে ডাকিতে পারে, জগদম্বা তাহাকে তৎক্ষণাৎ ক্রোড়ে করেন। আমরা গৃহে গৃহে প্রতিদিন কি প্রত্যক্ষ করি—আমরা দেখি মা শিশুসন্তানকে ভুলাইয়া রাখার নিমিত্ত শিশু কাঁদিয়া উঠিলে একটী চীনা পুতুল বা খেলনা শিশুর হাতে দিয়া নিজের কর্ম্মে মাতা চলিয়া যান। শিশু ঐ খেলনা পাইয়া কান্নাকাটী শেষ করিয়া মা মা বলিতে নিরস্ত হইল। মা নিজের কার্য্যে মনোযোগ দিলেন। আমার মাও সেইরূপ ছেলের কান্নাতে মা রবে আকুলিত হইয়া সংসারে স্ত্রী পুত্র কন্যা বেষ্টিত অতিথিশালা সন্নিবেশিত করিয়া দূরে ভাব লক্ষ্য করিতে থাকেন। যে ছেলে ঐ স্ত্রী-পুত্র খেলনা পাইয়াও মা মা রব ছাড়িতে পারে না, তাহাকে মাতা নিশ্চয়ই ক্রোড়ে স্থান দান করিয়া ভক্ত সন্তানের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। শঙ্করাচার্য্য একদিন উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া-

ছিলেন—"কুপুত্র জায়তে, ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি।" মা! আমি অশিক্ষিত, অদীক্ষিত, তোমার বীজ কি—মন্ত্র কি কিছুই জানি না। কেবল জানি যে বোবা সন্তানও মায়ের স্নেহের অধিকারী হয়। আমি যদি তোমাকে ডাক্‌তে নাও পারি তবু তুমি নিশ্চয়ই সন্তান বলিয়া এই পাষণ্ডের পাপমতি অঙ্কুশাঘাতে প্রতিনিবৃত্ত করিবে। মা! তোমার পূজা করিতে পারে—কার সাধ্য? দীক্ষা পাই নাই সত্য, কিন্তু মাকে ডাকিতে আবার দীক্ষা কি—শিক্ষাই বা কি? মা যখন সন্তানের জন্য ব্যস্ত, তখন কেবল মা মা বলিয়া হৃদয়ের ব্যাকুলতা জানাইতে পারিলেই—চোখের জল ফেলিতে পারিলেই ভক্তিযোগের অনুশীলন হইল। মা আমার কলুষনাশিনী—ত্রিতাপ-হারিণী—জন্ম-জরা-মৃত্যুভয়বারিণী। মা! এ জীবন-সংগ্রামে এ পামরকে ঐ কল্পদ্রুমরূপ পাদমূলে আশ্রয় দাও।

মা! শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনে—যখন দিবারজনীর পার্থক্য জ্ঞান তিরোহিত হইবে—শায়িত কি উপবিষ্ট—শয্যায় কি মৃত্তিকায়—জ্ঞান থাকিবে না, যখন শয্যাকণ্টক উপস্থিত হইবে—যখন অপানবায়ু সুষম্না পথে বাহির হইতে চেষ্টা করিবে—তখন হে পতিতপাবনী ত্রিভুবন জননী মা! তুমি বিনে কে আমায় ক্রোড়ে করিয়া এই—ভবধামের যবনিকা হইতে বাহির করিয়া লইবে। মা! তুমিই জ্ঞান,

তুমিই কর্ম্ম ও তুমিই ভক্তি। আমি পাতকী—নারকী; বিষয়রূপ পঙ্কিল-হ্রদে নিমগ্ন; আমার উপায় কি হইবে? মা! যাহারা তোমার ভক্ত ও তোমার সন্তান নামের প্রকৃত অধিকারী তাহারা ত নিজ বলেই বলীয়ান হইয়া সর্ব্বদমন শমন কিঙ্করকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া হাসিতে হাসিতে জগৎকে কান্দাইয়া বম্ ভোলানাথ বলিতে বলিতে মহাপ্রস্থান করে। আর আমার মত পাপিষ্ঠ—নর-নগণ্য—তোমার দয়া না হইলে—ভবসমুদ্রের পারে বসিয়া ইহজীবনের পূর্ব্ব ইতিহাস স্মরণ করিতে করিতে অনুতাপ-রূপ তুষানলে দগ্ধ হইবে। তাই বলি মা নগেন্দ্রবালিকে! কালভয়বারিকে—জগদম্বিকে! ও মা কালিকে! একবার ভক্তিহীন পাষণ্ড সন্তানকে ঐ অভয় পদপ্রান্তে স্থান দাও।



ত্রয়োদশ কাণ্ড।

—:*:—

"কবির হাউস করে হরি মিলন কি আও সুখ চাহে অঙ্গ।
পীড় সহে বিনু পদ্মিনী পুতন লেৎ উচ্ছঙ্গ॥"—কবির।

বেদ কর্ম্মকাণ্ডের লীলাস্থল, উপনিষদ জ্ঞান কাণ্ডের ক্রীড়া-ভূমি, পুরাণ ভক্তি মন্দাকিনীর অববাহিকা ক্ষেত্র। জীবের মুক্তির নিমিত্ত জীবমাত্রকেই ক্রমান্বয়ে ঐ তিনটী সেতু অতিক্রম করিয়া—"যোগমন্দিরে" প্রবেশ করিতে হইবে। যোগে প্রবেশ করিতে হইলে কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটীর সাধনা করিতে হইবে। যে ব্যক্তি "কর্ম্ম" না করিয়া একেবারে জ্ঞানের দিবারজনী সম আলোকিত অত্যুজ্জ্বল মন্দিরে প্রবেশ করিতে চাহেন, তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ মূর্খের ন্যায় সন্তরণ শিক্ষা না করিয়া—অগাধ জল সন্তরণ দ্বারা উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক। "কর্ম্ম" জ্ঞানের জনক। জ্ঞান কর্ম্ম ব্যতীত উদ্ভূত হইতে পারে না। বিষয়টী অতি জটিল বলিয়া একটু অধিক মনোযোগ দিতে হইবে। কর্ম্ম কি? অগ্রে তাহাই বলা যাউক। তৎপরে কর্ম্ম হইতে কি প্রকারে জ্ঞানের জন্ম হইল বিবৃত করা যাইবে। ভগবান গীতায় অর্জ্জুনের সংশয় ছিন্ন করিবার জন্য অতি পরিষ্কার ভাবে বলিতেছেন;—

"অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্ন সম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্ম সমুদ্ভবঃ॥

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥

ইহাদ্বারা আমরা বুঝিলাম প্রাণীর উৎপত্তি ও সংরক্ষণের অনুকূল জনক ক্রিয়া মাত্রই কর্ম্ম। বিজ্ঞান কি বলিতেছে :—

ধূম হইতে মেঘের উৎপত্তি, মেঘ হইতে বারিধারা, বারি-ধারা হইতে শস্যাদি ও শস্যাদি হইতে জীবগণের উৎপত্তি ও স্থিতি। আমাদের এস্থলে ভগবান ও বলিতেছেন "অক্ষর" হইতে "ব্রহ্ম" ব্রহ্ম হইতে "কর্ম্ম" কর্ম্ম হইতে "যজ্ঞ" যজ্ঞ হইতে (যজ্ঞের ধূম) জলদ পটল, জলদ হইতে অন্ন ও অন্ন হইতে প্রাণীগণ। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিলাম, কর্ম্ম ব্যতিরেকে প্রাণীর উৎপত্তি ও সংস্থিতি হইতে পারে না। বম্ ভোলানাথ। কর্ম্মই জগতের কেন্দ্র—কর্ম্ম জগতের মাধ্যাকর্ষণী শক্তি !!! কর্ম্ম ব্যতীত জীব ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারে না। নিজের নৈসর্গিক ও প্রকৃতিগত সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণের প্রাবল্যে জীব কর্ম্মস্রোতে অহর্নিশি ভাসিয়া যাইতেছে। এই অনন্ত কর্ম্ম জলধি মধ্যে জ্ঞান-রত্ন লুক্কায়িত রহিয়াছে। ডুবিয়া উঠাইয়া লও—খাঁটি রত্ন পাইবে—বিশুদ্ধ জ্ঞান রত্নের আলোকে আলোকিত হইবে। সংসারের ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে কখনই সে আলো নির্ব্বাপিত করিতে পারিবে না। সহস্র সূর্য্য একত্র

সমাবেশিত হইলেও তাহার নয়ন ঝলসান আভার উপমেয় হইতে পারে না। যিনি কর্ম্ম ব্যতীত জ্ঞান পাইতে চাহেন, তিনি স্বপ্নে বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, বাগবাজারের রসগোল্লা ভক্ষণ করিয়া রসনার ও উদরের তৃপ্তিলাভ করেন। কথাগুলি পরিষ্কাররূপে বুঝিবার নিমিত্ত কয়টী স্থূল দৃষ্টান্তের অবতারণা করা যাক্—"নিম্ব তিক্ত" এই কথাটী পুস্তক পড়িয়া শিখিয়াছ, কিন্তু নিম্ব তিক্ত কি মিষ্ট তাহা তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে না। সুতরাং নিম্বের তিক্ত সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান পুস্তক হইতে অর্থাৎ গ্রন্থকর্ত্তার অভিজ্ঞতা হইতে উপলব্ধি হইল। বাস্তবিক নিম্ব ও দেখিলে না কিম্বা স্বাদ গ্রহণে বুঝিলে না নিম্ব তিক্ত কি মিষ্ট। তুমি যদি একবার নিম্ব চয়ন করিয়া স্বীয় রসনায় স্বাদ লও, তবে নিম্বের তিক্ততা সম্বন্ধে যে তোমার জ্ঞান জন্মিবে, তাহা অতি পরিপক্ক ও খাঁটি। তাই বলিতেছিলাম নিম্ব আহরণ ও চর্ব্বণ রূপ কর্ম্ম হইতে নিম্বের তিক্ততার জ্ঞান সম্যকরূপে লাভ হইল। বিদ্যালয়ে তুমি শিক্ষা করিয়াছ—"পিতা মাতার সেবা করা উচিত"। তোমার এই কেতাবী জ্ঞান যদি পিতা মাতার সেবারূপ কর্ম্মে লিপ্ত না হয় তবে অঙ্কুরেই শুষ্ক হইয়া বিলীন হইয়া যাইবে। পিতা মাতার সেবার কার্য্য করিতে করিতে তোমার হৃদয়ে যে অপূর্ব্ব আনন্দের প্রকাশ হইবে তাহা অনুভূতির বিষয়। কেবল খেরসু

কথা নহে। সেবার ঔচিত্যানৌচিত্য সম্বন্ধে সেবা করিতে করিতে দৃঢ় জ্ঞান হইবে।

এই জন্যই বলিতেছি, এ সংসারক্ষেত্রে কেতাবী মৌলবী অপেক্ষা কায্যকারী মৌলবী শতগুণে প্রশংসার্হ। উপদেশ লও এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে কার্য্য কর। কার্য্য করিতে করিতে দৃঢ় জ্ঞান জন্মিবে। কর্ম্মস্থূল—জ্ঞান সূক্ষ। কর্ম্ম শারীরিক—জ্ঞান মানসিক। কর্ম্ম চর্ম্ম চক্ষুর বিষয়ীভূত, জ্ঞান মানস চক্ষুর বিষয়ীভূত বটে। কর্ম্ম সাকার—জ্ঞান নিরাকার। কর্ম্মের প্রসাদে চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সংযম হয়। মন স্থির হইলেই বিমলানন্দ অনুভূত হইতে থাকে। তৎপর তৎসঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব্বজ্ঞানের দিব্যালোক উদ্ভাসিত হইয়া শত দিবাকরের ময়ুখ-মালাকে হীনপ্রভ ও আবিল করিয়া তুলে।

তুলসী দাস বলিয়াছেন "দয়া ধরম্‌কামূল"। তোমার জীবনে এই কথা প্রতিবিম্বিত করা দুরস্তাং তুমি এই শুষ্ক উপদেশটী ব্যাগে করিয়া বসিয়াছ; তুমি যদি ঐ উপদেশানুযায়ী কর্ম্ম না কর তবে তুমি কখনই বুঝিতে পারিবে না দয়া কি প্রকারে ধর্ম্মের মূল ভিত্তি। কর্ম্ম কর—দয়া দেখাও, দেখিবে ঐ উপদেশে তোমার হৃদয়ে যে জ্ঞানের দাগ পড়িবে, তাহা আর ইহ জীবনে যাইবে না। তাই বলিতেছি নিরাকারবাদী ভ্রাতৃগণ! সাকারবাদীগণের পূজাদি কর্ম্মকাণ্ড মাত্র। তজ্জন্য তোমরা বিদ্রূপ কর

কেন? তোমরা ত বল ভগবান সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্র সর্ব্ব সময় বর্ত্তমান।

ভগবান যদি সর্ব্বব্যাপী তবে তিনি কি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত, নয়ন তৃপ্তিকর বর্ণে চিত্রিত আমার মায়ের মূর্ত্তিতে নাই? আমার মা কি বিশ্ব ছাড়া? তোমার "সর্ব্ব" কি সাকার বাদীর দেবদেবী ছাড়া? তোমার সর্ব্ব = সকল— হিন্দুর দেবদেবী? তুমি যাহাকে ভগবান বলিয়া ব্রহ্ম-মন্দিরে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছ, আমি তাহাকে আমার মণ্ডপ ঘরে ভগবতী বলিয়া ডাকিতেছি। তবে তুমি আমাকে দ্বেষ কর কেন? আমি ত বলি "নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে" তবে তোমার ও আমার মধ্যে পার্থক্য কি? তুমি বলিবে যিনি সর্ব্বময়-সর্ব্বত্রব্যাপী তাঁহাকে আবার আবাহন ও বিসর্জ্জন কর কেন? এই প্রশ্ন তুলিয়াই মহাত্মা রাম মোহন রায় গাহিয়াছিলেন—

"মন একি ভ্রান্তি তোমার।
আবাহন বিসর্জ্জন বল কর কার॥
যে বিভু সর্ব্বত্রে থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাঁকে,
তুমি কেবা আন কাকে, একি চমৎকার।
অনন্ত জগদাধরে, আসন প্রদান ক'রে,
ইহ তিষ্ঠ বল তাঁরে একি অবিচার॥
একি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবিদ্য সব,
তাঁরে দিয়া কর স্তব, এ বিশ্ব যাঁহার॥"

ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব কয় জন লোকের বুঝিবার শক্তি আছে? যাহার শক্তি আছে তাহার আর প্রাণ প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা নাই। তিনি স্বয়ং শুকদেব। জন্মিবার পর হইতে স্বভাব-যোগী। নির্ব্বিকার জীবন্মুক্ত জীবের পক্ষে ঐ সকল অনুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু ভগবান এই স্থানে বর্ত্তমান আছেন জানিয়া যদি এই কথা বলি যে, তুমি এই মূর্ত্তিতে আইস এবং যাবৎ আমি তোমার পূজা শেষ না করি তাবৎ তুমি এই স্থানে তিষ্ঠ; তাহাতে কি এই কথা বলা হইল যে ঈশ্বর অন্যত্র নাই—কেবল এই মূর্ত্তিতে আছেন। আমরা বুঝিলাম না এই প্রক্রিয়ার দ্বারা ঈশ্বরের সর্ব্ব ব্যাপিত্বের কি দোষ ঘটিল। আমার বিষয়াসক্ত কলুষিত মন সতত অবিনশ্বর বিষয়-সুখে এবং বাসনার তৃপ্তির নিমিত্ত ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান। সে অবস্থায় মনকে প্রকৃতিস্থ করিবার আশায় যদি- সম্মুখে স্থাপিত মনোরমা মূর্ত্তিতে ঈশ্বরকে আবাহন করিয়া কিয়ৎকাল রক্ষা করিতে পারি, তবে মনের একটি দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদনের কারণের সৃষ্টি করিলাম বই আর কিছুই নহে। সম্মুখস্থ দেবীই আমার মা-ত্রিলোকারাধ্যা জগজ্জননী, এই বিশ্বাসে যখন আমি তাঁহার পূজা করিতে বসি, তখন আমার হৃদয় পিপাসার্ত্ত ও ক্ষুধিত সন্তানের ন্যায় মায়ের নিকট ব্যাকুল হইয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে থাকে—চোখ দিয়া অবিরাম বারিধারা বর্ষিত হইতে থাকে—

এই সুখ, না ধুঁয়া ধুয়া দেখিয়া শুষ্ক পুষ্পিত বচন গুলি আওড়াইয়া বক্তৃতা করাতেই সুখ? সুসংস্করাপন্ন ভ্রাতৃগণ! আমাকে কু-সংস্করাবৃত মূর্খ বর্ব্বর বলিয়া ঘৃণা কর তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু অবলম্বন ব্যতীত আমি কিছুই ধারণা করিতে পারি না। হইতে পারে তুমি উচ্চ অধিকারী কাজেই equation এর মধ্যে তিনটী step ছাড়িয়া চতুর্থ step এ ফল বাহির করিতে পার, তুমি বড় mathemetician কিন্তু আমার ভাগ্যে তাহা হয় নাই। মায়ের সত্ত্বা সর্ব্বত্র আছে জানিয়াও বিশেষরূপে মা আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান ইহা বুঝিবার জন্য ঐরূপ অনুষ্ঠান করা যে কি অসত্যতা তাহা আমি বুঝি না।

যাহ'ক্—পূজা হোম যাগাদি ক্রিয়া কর্ম্ম কাণ্ডের অন্তর্গত এবং এই কাণ্ড হইতেই দৃঢ় জ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হয়। আবার জ্ঞান হইতে মহাপ্রাণের অনন্ত শক্তি ভাবিতে ভাবিতেই চো'খ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল পড়িতে থাকে। ভক্তি গঙ্গাজলে পাষাণের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। তাই আমি সাকার উপাসনায় লিপ্ত। নিরাকারের আবার উপাসনা কি? নিরাকারের উপাসনা আর আকাশ কুসুমের সুঘ্রাণ লওয়া উভয়ই এক। উপাসনা কথার অর্থভেদ কর, তাহাহইলে বুঝিবে নিরাকারের নিকটস্থ হওয়া আর বকের অণ্ড প্রত্যাশা উভয়ই তুল্য। উপাসনা কথা বলিলেই উপাস্য ও উপাসক দুইকথা স্বতঃই মনে

উদিত হয়। নিরাকার যদি তোমার উপাস্য তাহাহইলে তুমি উপাসকও নিরাকার না হইলে চলিবে না। কারণ—তুমি তোমার পিতার কথা বিদেশে বসিয়া ভাব দেখি, তোমার হৃদয়পটে কি কি কথা জাগে। পিতার কথা চিন্তা করা মাত্রেই তাঁহার আকৃতি তোমার স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠিবে; কিন্তু তোমার নিরাকার পিতার কথা ভাব দেখি কেবল ধূঁয়া—ধূঁয়া—ধূঁয়া—কুজ্ঝটিকা—কোয়াসা—নিবিড় অন্ধকার, তোমাকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। তুমি মুখে অনেক ফাঁকা আওয়াজ করিতে পার সত্য, কিন্তু হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দেখদেখি, কোন স্থানে কোন দাগ পড়িয়াছে কিনা? তাহাতেই তুলসীদাস সমস্যায় পড়িয়া বলিয়াছিলেন—

"নির্গুণ পিতা হামারা, সগুণ মাতোওয়ারি,
কারে নিন্দ, কারে বন্দ, দোন পাল্লা ভারি।"

নির্গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব রজ ও তমো গুণত্রয়ের অতীত পরম পুরাণ পুরুষের উপাসনা অসম্ভব, এমন কি—নির্গুণের উপাসনা আদৌ হইতে পারে না বলিয়া উপাসনা সাকারেরই হইয়া থাকে। তবে আর আমাকে বিদ্রূপ করিও না। তুমিও জড়জগৎ ও সৌরজগৎ অবলম্বন করিয়া নিরাকার ভাব, আমিও দেবীমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া উপাসনায় বসি। যাক্ যাহার যে পথ অবলম্বন করা বিধেয়, মা-ই—তাহাকে সেই পথে লইয়া যাইবেন।

এক্ষণ আবার মায়ের পূজায় বসি। দুর্গোৎসব পূজায় তিনটী পদ্ধতি আছে। কালিকাপুরাণ, বৃহন্নন্দীকেশ্বর ও দেবীপুরাণ মতে পূজার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ আছে। সময়ের হিসাবে নবমী, প্রতিপদ ষষ্ঠ্যাদি কয়টী কল্প আছে। প্রথমেই নবপত্রিকার স্নান। পূজার প্রারম্ভে কদলীতরু সংস্থা বিষ্ণুবৃক্ষঃ স্থলাশ্রয়া রম্ভারূপিনী মায়ের স্নানের ব্যবস্থা। মা কদলীবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছেন। রম্ভা মানবজীবন রক্ষার এক প্রধান উপাদান। যোগী ঋষিগণ অনেকে কেবলমাত্র রম্ভা আহার করিয়া জীবন-ধারণ করেন। যে শক্তিতে মানবের জীবন রক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হয় সেই শক্তিই মায়ের অনন্ত শক্তির শক্তি। তিনি চেতন ও অচেতনে যেমন আছেন উদ্ভিদেও সেইরূপ বর্ত্তমানা। কদলীতরু আমাদের বিবিধ প্রকারে উপকার সাধন করে। যৎকর্ত্তৃক আমরা বিশেষরূপ উপকৃত হই, সে আমাদের ঐকান্তিকী ও অহৈতুকী ভক্তির পাত্র। বিশ্ব-ব্যাপিনী অতসীবর্ণাভা মা আমার কদলীতরুরূপে জড়-জগতে বিদ্যমানা, তাই তাঁহাকে দেবী জ্ঞানে পূজা করি। আরও শুন—ঐ কদলী তরুর বপুকে কে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে—শাকাম্বরী রূপিণী কচ্চি, দুর্গা রূপিণী হরিদ্রা, জয়রূপিণী জয়ন্তী, লক্ষ্মী নিকেতন স্বরূপ বিল্ব শাখা, শোকহারী অশোক, সুরপুরের মাননীয় মান, ক্ষুন্নাশক দাড়িম, লক্ষ্মীরূপী ধান্য সমন্বিত রম্ভাতরু অপরাজিতা

লতা কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া ভক্ত গৃহে ভক্তের পূজা লইতে সম্মুখে দণ্ডায়মান।

যে নয়টী উদ্ভিদ্ সমন্বিত হইয়া মা আমার কদলী তরু রূপে সম্মুখে বর্ত্তমানা, তাহার প্রত্যেকটাই পূজার যোগ্য কিনা একটু প্রণিধান করিয়া দেখ। ধান্যই বিষ্ণুবক্ষবাসিনী কমলারূপিণী। ধান্য ব্যতীত আমরা কয়দিন জীবন ধারণ করিতে পারি? অন্ন আমাদের প্রাণ—অন্ন আমাদের স্থিতের কারণ, অন্ন বিনা জীবের জীবন ধারণ অসম্ভব। তাই অন্নরূপী মায়ের অভয় চরণাম্বুজ পূজা করিবার জন্য এ দীনহীনের আয়োজন। মা আমার স্বয়ং অন্নপূর্ণা তাই অন্নের অধিষ্ঠাত্রী। ভক্ত-বাসনা ও সর্ব্বার্থসাধিকা অনন্ত-রূপিনী মায়ের পূজায় ধান্যের ব্যবস্থা। মায়ের অনন্ত-মূর্ত্তি তাই নবদুর্গায় নয়টী উদ্ভিদের অবতারণা। মা যেমন জীবে তেমনি উদ্ভিদে জলে ও স্থলে সর্ব্বত্র রহিয়াছেন। সেইজন্য শঙ্করাচার্য্য সপ্তমে স্বর মিলাইয়া গাহিয়াছেন ;—

ত্বংভূমি, ত্বং জলৌঘস্তমসি হুতবহ স্তুঞ্চ জগৎ বায়ুরূপা।
ত্বঞ্চাকাশ মনশ্চ প্রকৃতিরপি মহৎ পূর্ব্বিকাহং কৃতিশ্চ।
আত্মা এবাসিমাতঃ পরমিহ ভবতী তৎপরং নৈব কিঞ্চিৎ॥

ইহাতে মায়ের বহুধামূর্ত্তি ও অনন্ত-রূপের কথাই সূচিত হইল।

জন্ম-মৃত্যু-ভয়-হরা মায়ের মুর্ত্তি অশোক বিল্ব ও, দাড়িম প্রভৃতি উদ্ভিদে পরিস্ফুট রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে,

যখন স্থান বিশেষ দুর্ভিক্ষানলে পুড়িতে আরম্ভ হয়—দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী সৌধপরিপূরিত নগরীকে মহাশ্মশানে পরিণত করে, তখনও আমরা দেখিতে পাই যে, কচ্চি, মান প্রভৃতি উদ্ভিদের দ্বারা কত লোক জীবন রক্ষা করে। ঐ সকল উদ্ভিদে জীবনরক্ষিনী-শক্তি বর্ত্তমান থাকায় উহাতেও মায়ের অনন্ত-শক্তির বিকাশ মাত্র বলিতে হইবে। ভয়ানক উৎকট ব্যাধির দমনার্থে উহা মহার্হ ভৈষজরূপে জীবদেহে অপূর্ব্ব ক্রীড়া করে। অনন্ত বিভূতি সম্পন্না ভক্তবৎসলা মা আমার ঔষধরূপে জীবদেহে বৈদ্যুতিক কার্য্য করিয়া ভক্তের দেহ ও মন বিমল পুলকে পুলকিত করত নয়নে আনন্দ-অশ্রুর উৎস খুলিয়া দিয়া ভক্তকে আনন্দ পারাবারে নিমজ্জিত করেন। মা আমার সকাম ও নিষ্কাম উভয় কামীর মনোরথ সিদ্ধ করেন বলিয়া মা আমার সর্ব্বার্থ সাধিকা। যোগানন্দে উন্মাদিনী মা আমার মুমুক্ষুর মুক্তিদাত্রী ও বুভুক্ষুর ভুক্তিদাত্রী। তাহার দৃষ্টান্ত সুরথ ও সমাধির জীবনে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। যদি চক্ষু থাকে—চাহিয়া দেখ প্রাণভরে। মা আমার মনোমোহিনীরূপে প্রসন্নবদনে সুরথের পূজা গ্রহণ করিয়া হৃতরাজ্য সুরথকে ও বৈশ্যকুলনন্দন সমাধির ভক্তি গঙ্গায় ভাসিয়া পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অতীত তত্ত্ব-জ্ঞান সমাধিকে প্রদান করিলেন। তাইবলি মা আমার সকাম ও নিষ্কাম উভয়-বিধ কর্ম্মবীরের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। এই ক্ষেত্রে প্রহ্লাদ ও ধ্রুবের চিত্র স্মরণ কর।

দানব-দলনী মায়ের দক্ষিণ-পার্শ্বে অচ্যুতানন্দ-দায়িনী সচ্চিদানন্দ-রূপিণী প্রাণীর স্থিতি বিবর্দ্ধিনী মা কমলা পদ্মাসনে দণ্ডায়মানা। পয়োধি-নন্দিনীর অপূর্ব্ব-মূর্ত্তি ও আভা দশদিক আলোকিত করিয়াছে। যিনি লক্ষ্মীরূপে সর্ব্বগৃহে বিরাজিতা—যিনি ধন ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাঁহাকে সকাম গৃহীর পক্ষে অবশ্যই ভক্তিরসে পরিপ্লুত ও আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া পূজা করা কর্ত্তব্য। দুর্গোৎসবের মত উৎসব আর হিন্দুর নাই। ইহাতেই অনন্ত দেবতার পূজা সম্পাদিত হইয়া থাকে। যাঁহার প্রসাদে আমরা ঐশ্বর্য্যের মুখ দেখি—সাংসারিক অভাবরূপ প্রবল বাত্যায় স্বীয় অস্তিত্বকে অটুট রাখিতে পারি—যিনি সুকৃতি সন্তানের গৃহে লক্ষ্মী তাঁহাকে পূজা করিতে কাহার আপত্তি হইতে পারে?

মাতঃ কমলে! তুমি করুণা না করিলে সমস্ত জগৎ মুহূর্ত্ত মধ্যে মহাশ্মশানে পরিণত হয়—ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব বিনষ্ট হয়—দুর্ভিক্ষানলে সমস্ত দগ্ধ হয়। শিবাকুলের আনন্দ বিবর্দ্ধিত হয়। নর-কঙ্কালে পথ অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে। মা তুমি আদ্যাশক্তি-মহেশ্বরী। তোমার দয়ার ঈষৎ হ্রাস হইলে মৃতমৎস্য জীবের ভোগ হইতে নদীতে চলিয়া যায়—সম্মুখস্থ প্রস্তুত অন্ন ভস্ম হইয়া বাত্যান্দোলিত সিমূল তুলার ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। মা! তোমার আর কি স্তব করিব? তুমি সুর পূজিতা, এ দীন অকৃতী সন্তান তোমার কি পূজা করিবে?

আবার ঐ দেখ লক্ষ্মীর দক্ষিণে কে ঐ ময়ূরাসনে অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে বীরবেশে আসীন ? যিনি দেবগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বীর—যাঁহার বীরত্বে ও রণ-নৈপুণ্যে—যাঁহার বাহুবলে দেবগণের বিজয়-লক্ষ্মী চিরদিন অচলা হইয়া রহিয়াছে—তাঁহাকে হায়! কি পরিতাপের বিষয়! মূর্ত্তি নির্ম্মাতা ঠিক একটি আধুনিক বিলাসী বাবুর আদর্শে গঠিত করিতেছে ; কিন্তু আমরা পূজা করি কার ? যে মহাশক্তি সমন্বিত হইয়া কার্ত্তিকেয় দেব-সেনাপতি হইয়াছিলেন—যাঁহার বীরত্বের ইতিবৃত্ত পুরাণের মুখে শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভীরু কাপুরুষের ধমনীতেও উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হয়—নিতান্ত অলসকেও কর্ত্তব্য সাধনাভিমুখে প্রধাবিত করে—নিস্তেজ হৃদয়েও তেজের সঞ্চার করে—দুর্ব্বলের বাহুতেও বল আনিয়া দেয়—সেই অপূর্ব্ব শক্তির পূজা করি। আর একপ্রাণে একতানে প্রার্থনা করি মা! তোমার দুর্ব্বল নিস্তেজ পতিত জাতীর হৃদয়ে দৈববল আনিয়া দাও—অদ্ভুত তেজের বিকাশ কর—ধমনাতে রক্ত প্রবাহ তর তর ভাবে প্রবাহিত কর। আরো বলি—মা! যে বলে বলীয়ান হইয়া তোমার কুমার সমস্ত দেবগণের গৌরব রবি হইয়াছেন, সেই বলের কণিকামাত্র আমার শরীরে প্রবিষ্ট করাইয়া সেই প্রাণে অনুপ্রাণিত কর। এই হইল পূজা। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়—দেশের এমনি অধোগতি যে প্রতিমা নির্ম্মাতা বীরের আদর্শ,

খুঁজিয়া না পাইয়া বীরের পরিবর্ত্তে 'বাবুর' সৃজন করিয়াছে। প্রতিনিধি পুরোহিত ঠাকুর মহাশয়ও তদ্রূপই পূজা করিতে বসিলেন। তাই বলিতেছিলাম ভাই! ধর্ম্মকার্য্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া কর্ম্ম সম্পাদন করা আর পরের জিহ্বায় খাদ্য দ্রব্যের স্বাদ লওয়া এবং ন্যায়ে অন্ধের দুগ্ধ দর্শন করা সমান কথা।

মা বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে সঙ্গে করিয়া ভক্তগৃহে সমুপস্থিতা। যদি কাহারও চোক থাকেত দেখিয়া লও, মা আমার জ্ঞানারণ্যের অধিষ্ঠাত্রী-কোমল-কমল-দলোপরি দণ্ডায়মানা বীণাপাণিকে লইয়া ভক্তের পূজা লইতে আসিয়াছেন। সকাম ও নিষ্কাম ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য মা আমার—চণ্ডীমণ্ডপ আলো করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বলিহারি যাই! এমন অপূর্ব্ব মূর্ত্তিনিচয়ের সমাবেশ আর কোন পূজায় দেখিয়াছ কি? তাই বলি দুর্গোৎসব কলির মহাযজ্ঞ। দুর্গোৎসবই কলির অশ্বমেধ। ভাই! সংসার ভুলিয়া, স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া, ঐ আদর্শমূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া অন্ততঃ তিন দিন মায়ের পূজায় একপ্রাণে লিপ্ত হও। সর্ব্ব কর্ম্মে সিদ্ধিলাভের জন্য যে শক্তির নিকট—জীবকূলের দ্বারস্থ হইতে হয় সেই শক্তি-সমন্বিত পার্ব্বতী নন্দন বিনায়কের পূজার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে। ক্রিয়া প্রারম্ভের পূর্ব্বে কার্য্যের সফলতা প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেক সকাম কর্ম্মী লক্ষ্য করিয়া থাকেন। তাই মা লম্বোদরকে সঙ্গে করিয়া ভক্তের

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ভক্তগৃহে উপস্থিত। সময় নষ্ট করিও না, ভাই সকাম ও নিষ্কাম উভয়বিধ কর্ম্মি! মা উভয়ের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিতে তোমার নিকট বর্ত্তমানা। যাহার যাহাতে অভিরুচি—তিনি তাহাই সর্ব্বার্থ সাধিকার নিকট পাইবেন। কল্প পাদপের মূলে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল অবিরত পড়িতেছে সকাম হও কামনার তৃপ্তি হইবে—নিষ্কাম হও—আরো ভাল। কর্ম্ম কাণ্ডে নানাপ্রকার উপসর্গ জুটিয়াছে বলিয়া ক্রিয়া কাণ্ডের নিকট জন্মের মত বিদায় লইও না।

সংসার ক্ষেত্রে সুখ কণিকা মাত্রও পাওয়া যায় না—দুঃখ অবিরাম—দুঃখ সাগরে জীব চিরকাল নিমগ্ন। চির-কাল অমাবস্যা—সংসার আকাশে পূর্ণিমার লেশ মাত্রও নাই। জীবের জীবনান্তে আত্মার শেষ হয় না, তাহাতেই ভারত, পরকাল লইয়া বড়ই ব্যস্ত। প্রাচ্য দর্শন দিব্য চক্ষে দেখিলেন অনন্ত জীবন জীবের জন্য ইহ লোকের যবনিকার বাহিরে অভিনয় করিতেছে। এই নশ্বর দেহ কয়দিনের জন্য? তদ্ধেতু জীবের মুক্তির নিমিত্ত অধি-কারী ভেদে আর্য্যশাস্ত্র চতুর্ব্বিধ পন্থার ব্যবস্থা করিলেন। সকলেই ব্রহ্ম সমুদ্রে মিশিবার জন্য—মুক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিবার হেতু জীবনের পথে অগ্রসর হইতেছি। বেদ কর্ম্ম কাণ্ডের বিস্তৃত পথ। বেদান্ত ও সাংখ্য জ্ঞানের অত্যুজ্জ্বল বর্ত্ম। ভাগবত ও বাইবেল ও কোরাণ ভক্তি-

ম্মার্গ ও পাতঞ্জল যোগের রাস্তা ধরিয়া "মুক্তি", ষ্টেশনে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত হাঁটিতেছেন। তাহাতেই ভারতে এত শাস্ত্রের প্রাচুর্য্য। তুমি যেরূপ সম্বলের লোক সেই-রূপ রাস্তা দিয়া চলিয়া যাও—সকলেরই গন্তব্যস্থল এক। বেদ প্রকৃতির শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিলেন কর্ম্মেই—মুক্তি, সাংখ্যকার বলিলেন জ্ঞানেই—মুক্তি, ভাগবত বলিলেন ভক্তিই মুক্তির দ্বার, পাতঞ্জলিও তদ্রূপ বলিলেন যোগই মুক্তি ষ্টেশনে পৌঁছিবার উত্তম বর্ত্ম। যেরূপ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মুলমন্ত্র Knowledge is power সেইরূপ সাংখ্যের মূলমন্ত্রও জ্ঞানেই শক্তি ও মুক্তি। ধর্ম্ম জগতে কেহ কাহাকেও উপহাস করিতে পারেন না! যিনি যে পরিমাণ উচ্চে উঠিয়াছেন তাহার জন্য সেই উচ্চাঙ্গের সাধন প্রণালী ব্যবস্থিত হইয়াছে। নিজে সেই পথে না হাঁটিলে কোন ফলই হইতে পারে না। প্রতিনিধি দ্বারা মুক্তি খুঁজিতে গেলে—মুক্তি পাওয়ার আশা কোথায়? তাহাতেই বলিতেছিলাম ধর্ম্ম জগতে এ একটা প্রধান উপসর্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন একটা সাধু পরমহংস বলিয়া-ছেন—জ্ঞান পুরুষ, ভক্তি স্ত্রী। মুক্তির অন্দর মহলে প্রবেশ করিতে জ্ঞানের সাধ্য নাই—তাহাকে বাহির বাটীতে, অপেক্ষা করিতে হইবে; কিন্তু ভক্তি বিনানু-মতিতে মুক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া থাকেন; সেই জন্য বলি ভক্তিই বর্ত্তমান সময়ে সিদ্ধির প্রধান উপায়।

অন্ধ বিশ্বাস ধর্ম্মের মূল। তর্কে কার্য্য হয় না। বিজ্ঞান ও দর্শন যাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না অন্ধ ধর্ম্ম বিশ্বাসী তাঁহার নাম উচ্চারণ করিবা মাত্র অশ্রুজলে বক্ষঃ ভাসাইয়া ফেলে। আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকে—গদ্ গদ্ বচনে বলিতে থাকে—

"ক্ষিতিস্ত্বং বিধাতা জগৎ স্থষ্টিকর্ত্রী
ত্বমাপোপি বিষ্ণু র্জগৎ পালিকা চ।
ত্বমগ্নিস্তু রুদ্রঃ জগৎ ক্ষোভ কর্ত্রী
ত্বমৈশ্বর্য্য রূপা জগৎ বায়ুরূপা।"

তুমি বলিবে বিজ্ঞান ও দর্শন সম্মত ধর্ম্ম না হইলে সে ধর্ম্ম মূর্খ বর্ব্বরে শোভা পায়—শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য নহে।

শিক্ষিত ভাই! তুমি কি জাননা—Learned ignorance is the end of philosophy and beging of religion বিজ্ঞান চাই না—তোমার পাশ্চাত্য সভ্যতা চাই না। আমাকে অন্ধ বিশ্বাসে কার্য্য করিতে দাও—তাহাতেই আমার শান্তি ও মুক্তি। মার নাম করিতে করিতে যখন চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইব—যখন স্ত্রী পুত্র পরিজন ভুলিয়া যাইব—যখন স্ফটিক স্তম্ভ মধ্যে মায়ের মূর্ত্তি দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে মা মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিব—যখন পরহিত ব্রতই জীবনের একমাত্র উপাসনা বলিয়া উপলব্ধি করিব—যখন

"বিস্তারঃ সর্ব্ব ভূতস্য বিষ্ণোর্বিশ্ব মিদং জগৎ।
দ্রষ্টব্য মাত্মবৎ তস্মাদ ভেদেন বিচক্ষণৈঃ॥"

জীবনে প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিব তখনই ভাই! জীবনের কার্য্য শেষ হইল মনে করিব।

মায়ের নাম স্মরণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ কর—ব্যাধির চিকিৎসা কর—উপসর্গের মূলে কুঠারাঘাত করিতে থাক—নিশ্চয়ই সুফল ফলিবে। প্রতিনিধি দ্বারা ক্রিয়া-কাণ্ড নির্ব্বাহি করা আর প্রসব বেদনা সহ্য না করিয়া পুত্রের মুখ দর্শন করা উভয়েই তুল্য। তাই বলি ভাই! প্রথমে কর্ম্মের দিকে অগ্রসর হও—কর্ম্ম করিতে করিতে যন্ত্র ঠিক কর। শরীর রূপ মহাযন্ত্রকে বিশ্ব যন্ত্রীর পূজায় নিযুক্ত কর—গঠিত হও তবে জ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হইবে। জ্ঞান যোগের যোগী হইয়া জীবনের পথে অগ্রসর হও—ভক্তি মন্দাকিনী আপনি আসিয়া তোমাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। কলিতে ভক্তিই যুগধর্ম্ম। প্রত্যক্ষ বাদী (Positivists) পণ্ডিতেরা কেবল কর্ম্ম লইয়া মহাব্যস্ত—তাঁহারা কর্ম্ম পর্য্যন্ত পৌছুছিয়া আর দূরে যাইতে চাহেন না। কিন্তু ঐ কর্ম্মের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রূপে জ্ঞানের আলো মৃণ্ময় আবরণাভ্যন্তরে স্তিমিত ভাবে জ্বলিতেছে—সাংখ্য ও বেদান্ত তাহা দর্শন করিয়া অমনি জ্ঞান যোগ হইতে সূত্র আরম্ভ করিলেন। জ্ঞান নীরস—বহু সাধনায় পাওয়া কঠিন। কপিল প্রমুখ মহর্ষিগণ

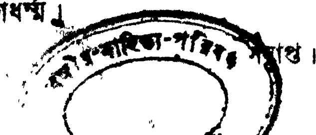
জ্ঞানের অত্যুজ্জ্বল আলো মস্তকে ধারণ করিয়া সমস্ত জগৎকে আলোকিত করিয়াছিলেন। তাহাতে দৈবকী নন্দন, মেরীর তনয়, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি ভক্তগণ ভক্তিরূপ ব্যোম গঙ্গায় অভিষিক্ত হইয়া তাহার হিল্লোলে হিল্লোলিত ও ব্রহ্মসমুদ্রে মিলিত হইয়াছিলেন। কর্ম্ম হইতে জ্ঞান ও জ্ঞান হইতে ভক্তি এবং ভক্তি হইতে মুক্তি। অনীশ্বর বাদী সাংখ্যে পুরুষ ও প্রকৃতির কথা বিশদরূপে লিপিবদ্ধ আছে। সাংখ্যকার বৈদিক কর্ম্ম-কাণ্ড কর্ম্মনাশায় ফেলিয়া সাংখ্য-শঙ্খে তুমুল শব্দ উত্থিত করিয়া বলিলেন—জ্ঞানেই মুক্তি। ভারতবর্ষ চিরকাল এক ধূয়া গাহিয়া আসিতেছে—সংসার কয় দিনের ? ভারতের দর্শন চিরকাল বলিতেছেন সংসার দুঃখময় ও অসার।

সেই অপার দুঃখ জলধি পার হইবার জন্য ন্যায়দর্শন শিক্ষিত জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া বলিলেন—জন্মই দুঃখের মূল, জন্মের মূল প্রবৃত্তি, রাগ দ্বেষ মোহাদি দোষ নিচয় প্রবৃত্তির একমাত্র হেতু ; দোষের আকর মিথ্যা জ্ঞান। অতএব মিথ্যা জ্ঞান বিনাশ করিতে না পারিলে জীবের দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি নাই। তত্ত্বজ্ঞানই একমাত্র ঐ মিথ্যা জ্ঞানের নাশক। ন্যায় শাস্ত্র তাহাই জগতে ঘোষণা করিলেন। বৈষয়িক দর্শন ও ঐ পথের পথিক হইয়া তত্ত্বজ্ঞানই দুঃখের মূল নাশের কারণ স্থির করিলেন। মীমাংসা দর্শন কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড লইয়া ব্যস্ত

রহিলেন। সাংখ্য দর্শন সমস্ত জগৎ কম্পিত করতঃ তারস্বরে বলিলেন—

জ্ঞানান্মুক্তিঃ। এই পঞ্চভৌতিক দেহরূপ পাদপস্থিত জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ বিহঙ্গম-দ্বয়কে একত্র করিয়া যোগ প্রভাবে কৈবল্যধামে পৌঁছাইতে পারিলে সর্ব্ব দুঃখের মূল উৎপাটিত হইবে এই জ্ঞান পাতঞ্জল দর্শন সমস্ত সভ্য জগতে বিকীর্ণ করিলেন। বেদান্ত বজ্র গম্ভীর নিনাদে বলিলেন—ভ্রান্তি জননী অবিদ্যাকে বিনাশ না করিলে জীব অবিরাম দুঃখ-প্রবাহে ভাসিয়া যাইবে। সকল উপনিষদ ও দর্শনরূপ মন্দাকিনীর বর্ষাসুলভ আবিল সলিল যশোদা নন্দনের পাদস্পর্শে পবিত্রীকৃত ও নির্ম্মল হইয়া গীতারূপে তৃতীয় পাণ্ডবকে প্লাবিত করত সমস্ত ভক্ত জগৎকে মাতাইয়া ব্রহ্ম কুণ্ডাভিমুখে চালাইতেছে। গীতায় সমস্ত দর্শন ও উপনিষদ ভাসিয়া গিয়াছে। গীতা এই নূতন যুগ আনিয়া ফেলিয়াছে।

কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তিযোগে ঈশ্বরের সমীপবর্ত্তী হইবার প্রকৃষ্টপন্থা গীতা সকলকে সমভাবে উপদেশ দিতেছেন অতএব গীতা প্রণোদিত পন্থাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথ; তাহাই সকলের আবশ্যকীয়। গীতা প্রণোদিত ধর্ম্মই বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম।



সমাপ্ত।


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ